প্রকাশক :
শ্রীসুনীত বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৩৮

মুদ্রাকর :
অ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স
৪৩৭ বি, রবীন্দ্র সরণী,
শোভাবাজার মোড়,
কলিকাতা : ৭০০ ০০৫

বৈষ্ণব পদাবলী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ/অনার্সের

পদসূচী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ/অনার্সের

পদসূচী

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ/অনার্সের পদসূচী

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ/অনার্সের

পদসূচী

ভূমিকা

(১)

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে বাঙালী চিত্তকে রসাপ্লুত করেছিল, সেই দুটি ধারাই ধর্মকেন্দ্রিক। একটি বৈষ্ণব পদাবলী, অন্যটি শাক্ত পদাবলী। এই দুটো ধারারই লক্ষ্য ছিল মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা। বাঙালী চিত্ত কোনোদিনই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রাখেনি। বরং প্রণয়ের নৈকট্য ঈশ্বরকে নানা সম্পর্কের বাঁধনে তাঁদের বিধৃত করেছিল।

ঈশ্বরকে ভজনার দ্বারাই জীবের পরম মুক্তি। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই ভক্তি। এই ভক্তি দুভাবে প্রকাশ পায়—হৈতুকী ও অহৈতুকী ভক্তি। কিছু কামনায় বা প্রত্যাশায় যখন ঈশ্বরকে আমরা ডাকি, তখন তা হৈতুকী ভক্তি; আর বিনা প্রত্যাশায় আনন্দাস্বাদনের জন্য যখন ঈশ্বরকে কামনা করি, তখন তা অহৈতুকী ভক্তি। এই ভক্তি নানাভাবে প্রকাশ পায়, যেমন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ইত্যাদি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, রুগ্ন, জিজ্ঞাসু, বিষয়কামী ও জ্ঞানী এই চার শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের ভজনা করে। এই ভক্তিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। "ভগবানে যাঁহার অনুরাগ নাই, এমন ব্যক্তিও অনেক সময়ে শাস্ত্রের আদেশে তাঁহার ভজনা করে। ইহার নাম স্বধর্মাচরণ। এই স্বধর্মপালন হইতে কালক্রমে ভগবানে ভক্তি জন্মে। এইজন্য ইহার নাম বৈধী ভক্তি। (বিধি বা নিয়মপালন হইতে যে ভক্তি জন্মে।) এইখানেই আচার-পালনের সার্থকতা।" মহাপ্রভু রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা বলেছেন। বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সখাভাবে, যশোদা পুত্রভাবে এবং গোপিনীরা পতিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এইভাবে আরাধনা করা সম্ভব নয়। কারণ শ্রীদামাদি সকলের লক্ষ্য আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নয়, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি

ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'। এই ভক্তিকে বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। আর যাঁরা বৃন্দাবনের কোনো একটি ভাবকে আশ্রয় করে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁদের ভক্তিকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। তাঁদের সাধনার মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের নিয়ম-কানুন পালিত না হলেও চলে। শ্রীভগবানে আসক্তি না জন্মালে রাগানুগা ভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না। একে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত রসের সাধনায় শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত নিষ্ঠা, অচঞ্চল মন এবং চিত্তে কামনার বিলুপ্তি। দাস্য রসে প্রভুরূপে ভজনা, সখ্য রসে সখারূপে, বাৎসল্য রসে সন্তানরূপে ও মধুর রসে দয়িতরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা। মধুর রসে প্রিয়তমের সুখই লক্ষ্য, ভক্তের নয়। মধুর রসে শ্রীভগবানই দয়িত, আর ভক্তমাত্রেই নারী। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ ও রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীরা মধুর ভাবেই ভজনা করেছেন, তাই তাঁদের রতি স্বকীয়া। কিন্তু গোপিনীরা কৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন—

> লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্মকর্ম।
> লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম।...
> সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
> কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম ও সেবন॥"

এই গোপিনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হচ্ছেন রাধা। তিনি মহাভাবময়ী, কৃষ্ণসুখই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রেম পরকীয়া।

যেখানে এই রসধারার বিচিত্র প্রকাশ ঘটে, তাকেই আমরা বলি রাস। এর মধ্যে মধুর রসের পদগুলি বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি অংশ অধিকার ক'রে আছে। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর মতে, "অপ্রাকৃত জগতে রাধাকৃষ্ণের যে নিত্যলীলা চলিয়াছে, যাহার ফলে পৃথিবীতে প্রতিদিন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাই মহাজন। আর তাঁহাদের রচিত কবিতা বা গানকেই বলা হয় পদাবলী।" এই পদাবলীকে যে আমরা গীতিকবিতা বলি, তা কি বস্তুনিষ্ঠ কবিতা না ভাবপ্রধান কবিতা? গীতিকবিতাকে

আমরা বলতে পারি অহংমুখী কবিতা। নিজের চোখ দিয়ে দেখে, নিজের মন দিয়ে উপলব্ধি করে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' তাকেই প্রকাশ করছে এই গীতিকবিতা। তবে এই আত্মগত প্রকাশ এমনই কৌশলে রচিত যা পাঠ ক'রে রসজ্ঞ পাঠকের চিত্তেও অনুরূপ ভাবের স্ফুরণ হয়। তবে ধর্মবিমুক্ত গীতিকবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব গীতিকবিতার মূলগত পার্থক্য আছেই। কারণ বৈষ্ণব গীতিকবিদের অধ্যাত্ম অনুভূতির অন্তরালে ব্যক্তিগত অপেক্ষা গোষ্ঠীগত আবেগানুভূতি অনেক বেশি সক্রিয়। তাই একালের গীতিকবিতায় যতখানি স্বাধীন ভাব প্রকাশের অবকাশ আছে, বৈষ্ণব গীতিকবিতায় পদরচয়িতাদের কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে পদ রচনা করতে হয়েছে। তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণব গীতিকবিতা যে একটি চিরকালীন মানবিক আবেদন জাগাতে পেরেছে, তা পদকর্তাদের মুন্সীয়ানার পরিচয় বহন করে। ধর্মের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যেও কবিচিত্তের অহংমুখী আকুতি ও তার যথাযথ প্রকাশ ধর্মের বন্ধন থেকেও মুক্তি দিয়েছে। তাই আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন, কবিদের এই অনুভূতির অন্তরালে তাঁদের ব্যক্তিগত আবেগানুভূতি যতখানি সক্রিয়, ধর্মের বন্ধন তাঁদের কল্পনাকে ততখানি নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে কিনা—

> "সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?"

প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের উল্লেখ করতে হয় আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের কথা। শঙ্করাচার্যের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। তাই ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করেন। তিনি তাই সগুণ। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর চোখে মায়াকল্পিত এই ঈশ্বরের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাই ব্রহ্মকে জানতে গেলে নেতিবাদের মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানতে হয়। আর তাঁকে

যদি বিশেষিতই করতে হয় তবে তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপের মিলিত বিগ্রহ। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। কিন্তু জগৎ মিথ্যা। যে শক্তির দ্বারা তিনি এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন, তার নাম মায়া। এই মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি বলে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। ব্রহ্মে কোনও ভেদ নেই বলেই ব্রহ্ম নির্গুণ। আমরা অবিদ্যার বশেই জগৎকে সত্য বলে মনে করি। একমাত্র মুক্ত পুরুষই জগতের এই মায়া উপলব্ধি করতে পারেন।

দক্ষিণ ভারতে রামানুজ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ক'রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। রামানুজের মতে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় বটে, কিন্তু জগতে যা চৈতন্যময় ও জড়পদার্থ তা ব্রহ্মেরই শরীর। ব্রহ্ম নির্গুণ নন, সগুণ; নির্বিশেষ নন, সবিশেষ। তাই রামানুজের ব্রহ্ম এক হয়েও জীবজগৎ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা নয়, কারণ তা ব্রহ্মের শরীর, আবার তা ব্রহ্মের মত নিত্য সত্য নয়। তাই তাঁর মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। প্রত্যেক মানুষেরই ব্রহ্মকে উপাসনা করা কর্তব্য। শ্রীভগবানের দেহ আমাদের দেহের ন্যায় প্রাকৃত দেহ নয় বটে, তিনি অনন্ত গুণের আকর। এই গুণের নিত্য স্মরণই উপাসনা। বেদান্তের অন্যতম ভাষ্যকার মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী। তাঁর মতে, ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তিনি সর্বদর্শী। ব্রহ্ম আনন্দময়, আবার অনন্ত ঐশ্বর্যময়। মধ্বাচার্যের মতে মুক্ত অবস্থাতেও জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্যভেদ বর্তমান। এই ভেদ জীবের সঙ্গে জীবের ভেদ, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের ভেদ, ঈশ্বরের সঙ্গে জড়ের ভেদ, জড়ের সঙ্গে জড়ের ভেদ, আবার জীবের সঙ্গে জড়ের ভেদ।

নিম্বার্কস্বামীর মতে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের ভেদ এবং অভেদ একই সঙ্গে বিরাজিত। ব্রহ্ম বৃহত্তম বস্তু, তিনি অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। পরমাত্মা অংশী, জীবাত্মা তাঁর অংশ। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য, ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন। প্রকৃতি ব্রহ্মের অংশ আর জগৎ এই প্রকৃতিরই পরিণাম। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ শ্রীকৃষ্ণে বিরাজ করত। আবার তিনিই সৃষ্টিকালীন জগৎরূপে প্রকাশ পেলেন। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর গ্রন্থে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন, তাকেই আমরা বলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিচারে মহাপ্রভু অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন করে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাকেই বলা হয় অচিন্ত্যাভেদাভেদতত্ত্ব। জীবের সঙ্গে কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ তাকেই বলে ভেদাভেদসম্বন্ধ। মহাপ্রভুর মতে, জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবক। মায়ার অধীনে তাঁর আত্মবিস্মৃতি ঘটে। মায়ার অধীন জীব ঈশ্বর থেকে পৃথক। কিন্তু ঈশ্বরই যখন অবিকৃত থেকে জীবরূপে পরিণত হন, তখন জীব ভগবান থেকে অভিন্ন বটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনিই কৃষ্ণ। আমাদের মত দেহ না থাকলেও তাঁর অপ্রাকৃত দেহ আছে। তাঁর সেবাতেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য যেমন অসীম, মাধুর্য তেমনি অনন্ত। বহির্মুখী জীব যখন কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার অধীন হয়, তখনই সে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হয়। ঈশ্বর শুধু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নন. তিনি আদি. অনাদি, সকল কারণের মূল কারণ। অর্থাৎ সৃষ্টির তিনি মূল কারণ। কেননা, জড়রূপা প্রকৃতি কখনও বিশ্বের কারণ হতে পারে না। সেজন্ত বেদান্তের মায়াবাদকে. আবার জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাকে মহাপ্রভু স্বীকার করেন না। মহাপ্রভু বলেন কর্ম, জ্ঞান ও যোগের পথ পরিত্যাগ করে একমাত্র ভক্তির পথ আশ্রয় করা উচিত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির বশীভূত।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে, শ্রীকৃষ্ণ নিজে রসাস্বাদনের জন্ত শ্রীরাধার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আর নামগান প্রচারই তার আনুষঙ্গিক ফল। শ্রীচৈতন্তের দ্বারা সেই উদ্দেশ্তই সাধিত হয়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি, যে শক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আনন্দকে আস্বাদ করেন, এই হ্লাদিনীর সার হচ্ছে প্রেম, প্রেমের সার হচ্ছে ভাব, ভাব থেকেই মহাভাব এবং শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিনী। তিনিই কৃষ্ণময়ী, শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূরণই তাঁর আরাধনা. তাঁর চোখে জগৎ কৃষ্ণময়। শ্রীচৈতন্তদেব এই রাধাভাবে ভাবিত হয়েই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন আমি আস্বাগু, রাধা আস্বাদনকারিণী। রাধার

প্রেম আমার চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে বটে, কিন্তু আমার চেয়ে কোটিগুণ আনন্দ শ্রীরাধা নিজে আস্বাদ করেন। তাই রাধার প্রণয়মহিমা আস্বাদ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে ভাবিত হয়েছিলেন। সেই রাধাভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাধুর্য আস্বাদ করেছেন।

চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে তত্ত্বগত ও দর্শনগত যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, রসাস্বাদনের দিক দিয়েও আমরা পদাবলীর মধ্যে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। চৈতন্যপূর্ববর্তী পদকর্তাদের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। এই কবিরা পরবর্তী কবিদের মতোই বিভিন্ন বিষয়ে পদ রচনা করেছেন। আমরা এখানে বিষয় অনুসারে তাদের সংজ্ঞা উল্লেখ করছি মাত্র।

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা :

রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক ও চৈতন্যবিষয়ক যে পদাবলী আমরা পাই, সেখানে মধুর রসের তুলনায় অন্যান্য রসের পদ সংখ্যায় অল্প হলেও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের সংখ্যা অল্প নয়। চৈতন্যপরবর্তী যুগে মহাজনদের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রস আস্বাদনের জন্য রাধা ভাবরূপ ধারণ ক'রে চৈতন্যরূপেই অবতীর্ণ হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আমরা পাই নরহরি সরকার, মুরারী গুপ্ত ইত্যাদি। মুরারী গুপ্তই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেবের জীবনচরিত রচনা করেন। মহাপ্রভু নিজের আচরণের দ্বারা বাঙালীকে শিখিয়েছিলেন কীর্তন গানের দ্বারা কিভাবে ভগবানের আরাধনা করা যায়। উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম, লীলা ও গুণাদির অভিব্যক্তিকেই কীর্তন বলা হয়। গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা এই কীর্তনগানের সূচনা হয়। গৌরচন্দ্রিকা শুনে শ্রোতারা বুঝে নিতে পারেন, কোন্ বিষয়বস্তুর ওপরে পালাগান হবে। গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তক নরোত্তম দাস। মহাপ্রভুর মৃত্যুর পর তিনি বৈষ্ণব সমাজের উল্লেখযোগ্য নেতা।

নায়িকার অবস্থাভেদে আটটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। (১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জিকা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) বিপ্রলব্ধা, (৫) খণ্ডিতা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্তৃকা, (৮) স্বাধীনভর্তৃকা। অভিসারিকা—যিনি নায়কের উদ্দেশ্যে সংকেত স্থানে গমন করেন। এই অভিসারকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—দিবাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, বর্ষাভিসার ইত্যাদি। বাসকসজ্জিকা,—যে নায়িকা সুসজ্জিতা হ'য়ে কুঞ্জ সাজিয়ে প্রিয়তমের অপেক্ষা করে। উৎকণ্ঠিতা—প্রিয়তমের আসার বিলম্ব দেখে যে নায়িকা উদ্বিগ্ন হয়। বিপ্রলব্ধা—প্রিয়তম আসবেন এরূপ সংকেত করেছিলেন কিন্তু তিনি এখনও এলেন না, হয়ত অন্য কোনও নায়িকার সঙ্গে তিনি প্রণয়াসক্ত, আমি বঞ্চিতা এরূপ চিন্তায় খেদযুক্তা নায়িকাকে বলে বিপ্রলব্ধা। খণ্ডিতা—প্রিয়তমের দেহে ভোগচিহ্ন দেখে যে নায়িকা ক্রুদ্ধা হন। কলহান্তরিতা—তিরস্কৃত নায়ক চলে গেলে যে নায়িকা অনুতপ্তা হন। প্রোষিতভর্তৃকা—প্রিয়তম প্রবাসে গেলে যে নায়িকা কাতর হন। স্বাধীনভর্তৃকা—যে নায়ক সর্বদা নায়িকার বশীভূত।

পূর্বরাগ--মিলনের পূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বংশীধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা যে রতি উৎপন্ন হয় এবং যা নায়ক-নায়িকার হৃদয়কে বিকশিত করে, তাকে বলে পূর্বরাগ। পদাবলী সাহিত্যে রাধার পূর্বরাগের পদের সংখ্যাই বেশী, তবে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদও সংখ্যায় কম নয়। পূর্বরাগের দশ দশা—লালসা, উদ্বেগ, নিদ্রাহীনতা, অঙ্গের কৃশতা, জড়িমা, অসহিষ্ণুতা, দেহের পাণ্ডুতা, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু। পূর্বরাগের পদরচনায় সার্থকতা দেখিয়েছেন কবি বিদ্যাপতি এবং বিশেষভাবে চণ্ডীদাস।

অভিসার—পথের বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সংকেতকুঞ্জে শ্রীরাধিকার যে গোপন যাত্রা, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাকেই অবলম্বন করে বেশির ভাগ অভিসারের পদ। অভিসারের পদ রচনায় চৈতন্য পূর্বযুগের উল্লেখযোগ্য কবি বিদ্যাপতি এবং চৈতন্য উত্তরযুগে গোবিন্দদাস কবিরাজ।

মান—নায়ক-নায়িকা যেখানে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, সেখানেও অকারণে

কখনও বা সামান্য কারণবশতঃ নায়িকার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হলে, সেই ঈর্ষাহেতু নায়িকা নায়কের প্রতি বিরূপ আচরণ করলে তাকে মান বলে।

প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়তমের কাছে থেকেও প্রেমের উৎকর্ষতাহেতু যে বিরহের আর্তি, তাকেই বলে প্রেমবৈচিত্ত্য। বৈচিত্ত্য অর্থ ব্যাকুলতা।

আক্ষেপানুরাগ—প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি দিক আক্ষেপানুরাগ। অনুরাগ চার প্রকার—আক্ষেপানুরাগ, রূপানুরাগ ইত্যাদি। বিরহ-কাতরা রাধা যখন কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ নিজেকেই নিজে আক্ষেপ করে, বংশীধ্বনি শুনে আকুল হ'য়ে আত্মসমর্পণের জন্য যখন আক্ষেপ করে, কখনও কৃষ্ণ, কখনও মুরলী, কখনও গুরুজন, কখনও বিধাতা, কখনও সখী নানাজনের প্রতি শ্রীরাধা তার আক্ষেপ ও অন্তরের বেদনা প্রকাশ ক'রে যখন নিজেকে ধিক্কার দেয়, তখনই হয় আক্ষেপানুরাগ। কৃষ্ণের প্রতি আসক্তির জন্য শুধু গুরুজনের নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়, নিজের ওপর কোনও প্রভুত্ব নেই, আবার কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনেরও কোনও উপায় নেই, এই অবস্থাকে বলে আক্ষেপানুরাগ।

প্রার্থনা—ঈশ্বর যেখানে ঐশ্বর্যময়, যেখানে তিনি অনাদি অনন্ত সর্বশক্তিমান, সেখানে ভক্ত দীনভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে। অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা, যথার্থ অনুতাপে দগ্ধ হয়ে মানুষ নবজন্ম লাভ করে। তার থেকেই সাধকের অন্তরে জাগে দৈন্য ও আর্তি। বিদ্যাপতি প্রার্থনার পদ রচনায় সবচেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

নিবেদন—প্রার্থনার মধ্যে আমরা যেমন উপাস্য এবং উপাসককে পাই, নিবেদনের পদে পরস্পর আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়। এই নিবেদনেই প্রেমের চরম নিদর্শন। নিবেদনের পদে রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের মধ্যে সখ্য ও আত্মনিবেদনের ভাবটাই পরিস্ফুট। এই নিবেদনের মধ্য দিয়েই সকল দ্বৈতভাবের বিলুপ্তি ঘটে। এখানেই প্রেমের চরম সার্থকতা। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস নিবেদনের পদ রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মাথুর—মথুরায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে সংহার করেছিলেন, কিন্তু তিনি আর

বৃন্দাবনে ফিরে এলেন না। সকলকে বিদায় দিয়ে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা শুরু হল। বৃন্দাবনে ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা। তাই কৃষ্ণবিরহে সমগ্র বৃন্দাবন অন্ধকার, বিরহের বেদনায় হাহাকার ক'রে উঠলো সকলে। মাথুরের পদরচনায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব অতুলনীয়।

ভাবোল্লাস—ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলন বলতে আমরা বুঝি, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে সমগ্র বৃন্দাবন শোকে আচ্ছন্ন। শূন্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার বিরহের আর্তি শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফেরেননি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে শ্রীরাধা তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই ভাবরাজ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই মিলনের নামই ভাবসম্মেলন বা ভাবোল্লাস। ভাবোল্লাসের পদরচনায় বিদ্যাপতি সর্বাপেক্ষা সার্থকতা লাভ করেছেন।

ব্রজবুলি ভাষা কৃত্রিম ভাষা। তাই কোনো বিশেষ অঞ্চলের এটি যেমন কথ্য ভাষাও নয়, লিখিত ভাষা তো নয়-ই। এই ভাষা আসলে মিশ্র মৈথিলী ভাষা থেকে উদ্ভূত; যার প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি। এই ভাষার একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে, যাতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পদকর্তা বাংলা ছেড়ে এই কৃত্রিম ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এই ভাষা এমনই মধুর যে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যদেবের মাধুর্য বর্ণনা এই ভাষার মাধ্যমেই প্রকৃষ্ট ভাবে হতে পারে। তাই হয়তো এই ভাষা ব্রজের ভাষা বা ব্রজবুলি নাম পেয়েছে।

বৈষ্ণব কবিদের সংখ্যা বহু। কিন্তু কবিত্বের মহিমায় কয়েকজনই দেশকাল ও ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে আজও কাব্যমহিমায় চিরকালীন মূল্যে বাঙালীর চিত্তে স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। এক একজন কবি বিশেষ এক এক ধরনের পদরচনায় সার্থকতা অর্জন করেছেন। যেমন বিদ্যাপতি প্রার্থনা, ভাবসম্মিলন, বয়ঃসন্ধি, অভিসার, মাথুরবিষয়ক পদরচনায় সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তেমনি চণ্ডীদাস পূর্বরাগের, নিবেদনের পদ রচনায়, জ্ঞানদাস আক্ষেপানুরাগের

পদরচনায়, গোবিন্দদাস অভিসারের পদরচনায়, বলরাম দাস ও যাদবেন্দ্র বাল্যলীলার পদরচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন।

এইসব কবিদের মধ্যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস—এবং চৈতন্যের সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগে পাই, পদাবলীর চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য এবং জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। যেসব পদ আজও রসিকচিত্তকে মুগ্ধ ক'রে, ধর্মীয় গণ্ডীর বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে—রসের শাশ্বত লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেইসব পদগুলি চিরকালীন কাব্যের মর্যাদা পেয়েছে। তা' রাধাকৃষ্ণ বা চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদ ব'লে নয়, নরনারীর চিরন্তন প্রেমলীলার বিচিত্র আলোছায়ার প্রকাশ ঘটেছে বলেই চিরন্তনতার মর্যাদা পেয়েছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনায় শুধু রসাস্বাদ বা কাব্যিক সৌন্দর্যবিচার যেমন একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়, বৈষ্ণব-সাহিত্যের তাত্ত্বিক দিকের সম্যক জ্ঞান-ও যে প্রয়োজন সেকথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। আমরা বৈষ্ণব কবিদের কাব্যাস্বাদ করেছি এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যরচনার কিছু তাত্ত্বিক ও পটভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছি। বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার জন্য কিছু সংজ্ঞা জানা দরকার।

পরকীয়া তত্ত্ব—তত্ত্বের বিচারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন এবং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ অংশের প্রকাশ বলে কৃষ্ণের স্বকীয়। কিন্তু লৌকিক বিচারে আমরা দেখি, শ্রীরাধা বৃষভানুনন্দিনী ও আয়ানের স্ত্রী। কাজেই কৃষ্ণের পরকীয়া। এইভাবে দেখ্‌লে আমরা দেখি, তত্ত্বের দিক দিয়ে জীব কৃষ্ণেরই অংশ ও তাঁর স্বকীয়। কিন্তু এই জীব রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শযুক্ত জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে জগতের স্বকীয় মনে করে, কৃষ্ণের নয়। যখন জীব স্বকীয় জগতের বন্ধনের বাধা অগ্রাহ্য করে, ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেয়, তখন তার সে অভিসারযাত্রা পরকীয়া।

গোপীতত্ত্ব—কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার নিত্যলীলা। তিনিই হ্লাদিনী শক্তি।

ভক্ত জীবের প্রতীক রাধা। কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যলীলাকে মধুরতর করে তোলবার বাসনায় সখীদের আবির্ভাব। সখীদের মিলিত রূপই যেন শ্রীরাধা। তাই রাধাহীনা সখী বা সখীহীনা রাধা কল্পনা করা যায় না। তাই সখীদের দ্বারাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পুষ্টি।

গৌরতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কাছে এক বিশেষ রূপে প্রকাশ পেয়েছেন। ভক্তরা তাঁকে মনে করতেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। তিনি বহিরঙ্গে রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। অপ্রাকৃত গোলোকে রাধাকৃষ্ণের লীলা তাঁর জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমাকে আস্বাদ করবার জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোহে হৈলা এক ঠাঁই॥"

শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের ভজনা করতেন বলে বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাভাবেরই প্রাধান্য।

মহাজন—"ঋষিরা যেমন মন্ত্রের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা, বৈষ্ণব সাধকও তেমনি শ্রীরাধাগোবিন্দলীলার প্রত্যক্ষ দর্শক। এইজন্য তাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলে। প্রত্যক্ষদর্শন হেতু বৈষ্ণব কবিতা শুধু মিষ্ট কথার সমষ্টি মাত্র নহে। ইহার এক একটি কবিতা যেন এক একখানি চিত্র।"

লীলাশুক—"বৈষ্ণব কবিমাত্রেই লীলাশুক। কেননা, রাধাকৃষ্ণের লীলা নিত্যবস্তু, ভক্ত কবি চাহেন সেই লীলা দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিতে, সেই লীলাগান করিয়া রসনার সার্থকতা লাভ করিতে।...সাধক কবির পরিচয় হইল মধুর বৃন্দাবনলীলাকে অদূরের কদম্ব বৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আস্বাদন এবং

শুকের ন্যায় মধুর কাব্যকাকলীতে তাহারই মাধুর্য বর্ণন।...সুতরাং 'লীলাশুক কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।"

(২)

বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি। এবার বৈষ্ণব পদকর্তাদের কবিকৃতি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা দেশে সমাজ ও সাহিত্যে এমন গভীর-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে বাঙালীর চেতনায় চৈতন্য-পূর্ববর্তী সাহিত্য ও চৈতন্য-পরবর্তী সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। চৈতন্য-পরবর্তী সাহিত্য অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত যে সাহিত্য। চৈতন্য-পূর্ববর্তী সাহিত্যে আমরা ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের প্রভাবটুকুই শুধু লক্ষ্য করি।

চৈতন্যপূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসকে। জয়দেব বিদ্যাপতির পূর্বে পুরাণ বা ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণলীলার উল্লেখ পাই, সেখানে রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাই প্রকাশ পেয়েছে। জয়দেব বিদ্যাপতি প্রথম দুজন কবি, যাঁরা রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের চেয়ে মাধুর্যভাবকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে আমরা প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধ্যে মাধুর্যভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করি। কিন্তু বিদ্যাপতির রচনায় জয়দেব অপেক্ষা মাধুর্যভাবের প্রাধান্য সহজেই নজরে পড়ে। এই ঐশ্বর্য-মাধুর্যের যে দ্বন্দ্ব, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের কাছে তার সমাধান হয়ে যায়। কারণ চৈতন্যের প্রভাবে মাধুর্য ভাবই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে প্রাধান্য পায়। তাই চৈতন্যপরবর্তী পদকর্তাদের রচনায় মাধুর্যভাবের অবিমিশ্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

পুরাণে শ্রীরাধার নাম নেই বটে, তবে তার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রধানা গোপিনীর উল্লেখ পাই। সেই গোপিনীরও কোনো নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ এবং গোপী প্রেমকাহিনী ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়তে বিস্তৃতভাবে

বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীকে সমুন্নত করার চেষ্টা দেখা যায় বিষ্ণুপুরাণে। হালের গাথাসপ্তসতীতে রাধার উল্লেখ পাই বটে, কিন্তু সে উল্লেখের প্রাচীনত্ব নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায়, জয়দেবের আগেই কোনও এক সময় বাংলাদেশে রাধাতত্ত্ব জন্ম লাভ করে। জয়দেবই প্রথম এই বিচ্ছিন্ন রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে পূর্ণাঙ্গ এবং নাটকীয় রূপ দেন। জয়দেবের কাব্যে প্রেমের সমস্ত পর্যায়ের নিখুঁত রূপায়ণ, মানবিকতা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা এত গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে এই প্রেমলীলার মধ্যে কোনও অধ্যাত্মব্যঞ্জনা থাকতে পারে তাও আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় নিবেদনের মধ্যেও জয়দেব অভিনবত্ব দেখালেন। ঐশ্বর্যভাবের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে মানবিকতার স্তরে নামিয়ে এনে প্রেমের সর্বোচ্চ মূল্য দান করলেন কবি যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বললেন, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' তাছাড়া চৈতন্যপরবর্তীকালের পদকর্তারা সবাই সখীভাবে রাধাকৃষ্ণ লীলা আস্বাদন করেছেন। জয়দেবই প্রথম এই সখীভাবের প্রবর্তনা করেন।

বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের হাতে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার আরও রূপান্তর ঘটে। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি। তিনি শুধু রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদই রচনা করেননি, কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেন। তার ফলে তাঁর রচনায় জ্ঞানের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, রাজসভার পরিবেশ অবিমিশ্র ভক্তির পরিবেশ নয়। রাজকর্মচারীদের চিত্তভোষণের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গীর পরিচয় লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনায়। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনার মধ্যে প্রেমের আদর্শায়িত রূপ অপেক্ষা রাজসভাসুলভ চটুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনাতেও সংস্কৃত অলংকার রীতিকে মেনে নিয়ে জয়দেব ও বিদ্যাপতি দু'জনেই নায়ক-নায়িকার লক্ষণ মিলিয়ে রাধাকৃষ্ণকে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগের পদকর্তারা তাঁদের কবিদৃষ্টির সম্মুখে বারবার শ্রীচৈতন্যের ভাববিগ্রহকে লক্ষ্য করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার

রূপবর্ণনাও শ্রীচৈতন্যের রূপ ধ'রে করার ফলে তা একটি অন্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। চৈতন্যপূর্ববর্তী কালের কবি বলেই বিদ্যাপতির পূর্বরাগ বিষয়ক পদের চিত্রণে সেরকম গভীরতা বা আর্তি ফুটে ওঠেনি। অন্যদিকে বিদ্যাপতির অভিসারবিষয়ক পদের যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রেমের যে দুর্বার গতিবেগ তা সার্থক-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী পদকর্তারা বিদ্যাপতির এই কবিকৃতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। আবার মান বিষয়ক পদে বিদ্যাপতির রচনায় পরবর্তী পদ-কর্তাদের মতো হৃদয়াবেগের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃত নায়িকা লাঞ্ছিতা বা বঞ্চিতা হ'লে যেভাবে অভিযোগ জানায়, বিদ্যাপতির রাধা সেভাবেই যেন অভিযোগ জানিয়েছে। ক্ষণিক বিরহবর্ণনায় অলংকারের কৃত্রিম বাঁধনে পদগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু মাথুর বিরহ বর্ণনায় তিনি সমস্ত কৃত্রিম বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে প্রাকৃত মালিন্য থেকে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক লোকে প্রয়াণ করেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম প্রকাশ এই মাথুর বিষয়ক পদাবলীতে লক্ষ্য করা যায়, যেমন সার্থকতা লাভ করেছেন তিনি ভাবসম্মিলন-বিষয়ক পদরচনাতেও।

শ্রীমতী প্রতীক্ষায় রত প্রিয়ের জন্য। নিজের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই হবে তাঁকে স্বাগত জানাবার মাধ্যম। এইভাবেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চাইছিলেন। শ্রীরাধা বলছেন—"বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে। ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।" The human body is the highest temple of God—এই উক্তির সার্থকতা এই শ্রেণীর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। রসের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, বহুদিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায় নায়িকার অপূর্ব মিলনানন্দের কল্পনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে এই পদটিকে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন প্রসঙ্গ বলেই মনে হয়। এ ধরণের সার্থকতা মাথুর বিষয়ক পদ—'চির চন্দন উরে হার না দেলা' এবং 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

রাধা বলছেন, 'হে মাধব, তুমি-ই তো আমার সব। তুমি কেমন—আমাকে বলে দাও। মালা রূপকযুক্ত উল্লেখ অলংকারের সাহায্যে কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের এই একাত্মতা প্রমাণ করেছেন—

'হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥'

কবি বলছেন, তোমরা দুজনেই দুজনের মত। ভগবান যেমন অসীম, ভক্তের প্রেমও তেমনি অসীম।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর দু'টি ধারা—(১) লৌকিক ধারা, (২) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত ধারা। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এই লৌকিক ধারাই অনুসৃত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস এই লৌকিক ধারাকে আশ্রয় করেছিলেন বলেই প্রেমের প্রারম্ভিক স্তরে তা অনেকাংশে স্থূল। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিণামে এই ভাবকে কবি একটা উন্নততর লোকে উত্তীর্ণ করেছেন। যে মানবিকতার সূচনা জয়দেব-বিদ্যাপতির কাব্যে পাই, তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। কিশোরী এবং মুগ্ধা নায়িকা রাধার প্রণয় শ্রীকৃষ্ণ জোর ক'রে লাভ করতে চাইছেন বটে, কিন্তু এই মুগ্ধা ও কিশোরী রাধাকে বড়ু চণ্ডীদাস ধীরে ধীরে নাটকীয় পরিবেশের ভিতর দিয়ে রাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রণয় সঞ্চার ক'রে প্রেমপ্রৌঢ়া রাধারূপে কাব্য শেষ করেছেন। যে আর্তি দিয়ে বড়ুর কাব্যের সমাপ্তি ঘটেছে, পরবর্তীকালে সেই আর্তিকে আশ্রয় করেই বৈষ্ণব কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছে উন্নততর লোকের দিকে। তাই রাধা চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় ক্রমবিকাশ থাকার ফলেই জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্য অপেক্ষা বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রেমের দুর্নিবার আবেগ লক্ষ্য করা যায়।

চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী না পরবর্তী এই সমস্যা থাকলেও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার পরিকল্পনায় যে গভীরতা, আধ্যাত্মিকতার

প্রকাশ ঘটেছে, তাতে এই পদাবলী শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক প্রভাবিত বলেই মনে হয় এবং তাঁরই ভাববিগলিত মূর্তির কথা মনে পড়ে। তবে এই প্রণয়লীলা কাহিনীর মধ্যে প্রেমের কোনও বিকাশ নেই। প্রথমে যে প্রেমপ্রৌঢ়া রাধিকাকে আমরা দেখি, শেষেও সেই রাধিকাই। শ্রীরাধার প্রথম প্রেমানুভূতিতে যে তীব্রতা, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য যে সাধনা চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই না-পাওয়ার বেদনা, মিলনের মধ্যেও অতৃপ্তি—

"দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" শিল্পবোধের বিচারেই হোক বা আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়েই হোক প্রেমের পরিকল্পনায় চণ্ডীদাসের কাব্যে তা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের আদর্শ কীর্তনে এত আবেগময়তা অন্য কবির কাব্যে সুদুর্লভ—

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি।"

—শুধু এই জন্মেই নয়, যতবার আসব যাব, যত জন্ম হবে, তুমি-ই আমার একমাত্র প্রিয় থেকো।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের রাধা পরিকল্পনার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ রাধাভাবের ছবি ছিল। তার ফলে এঁদের পদাবলীর মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। আবার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদকেও সচেতনভাবে রাধাকৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন এই সমস্ত কবিরা।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব থাকার ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধ্যে যে লৌকিক দিক ছিল, সেদিকটি সহজে নজরে পড়ে না। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে দেখি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় শুরু হয়েছে বাল্যকাল থেকেই। এই লীলা চিত্রিত করা সম্ভব হয়েছে শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মিক ভাবরূপের প্রতিফলনের জন্য। এ শ্রেণীর প্রেমাস্বাদন লৌকিক নরনারীর পক্ষে অস্বাভাবিক। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী যেখানে সার্থক, সেখানে আধ্যাত্মিকতা

প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু যেখানে কাব্য হিসেবে সার্থক হয়নি, সেখানেও আধ্যাত্মিকতার ইংগিত পাই।

অপরদিকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের রচনায় যেখানে কবিতা অসার্থক, সেখানে প্রাকৃত প্রেমের ইংগিতটুকু পাই—যা চৈতন্যপরবর্তী পদাবলীর ধারায় নেই।

চৈতন্যপরবর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী বর্ণনায় কিভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, সে সম্বন্ধে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গোবিন্দদাস বর্ণনা করেছেন—

"বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারয়ি
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়াভাবে ভক দেয় ক্রোড়।"

এখানে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীরাধার বিরহের দশ দশা চিত্রিত করতে গিয়ে গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের কথা বিবৃত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে রাধা প্রায় মূর্ছিতা হয়ে পড়তেন যখন, তখন সখীরা শ্রীরাধার কানে বারবার শ্যামনাম শুনিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতেন। বিরহজনিত শোকে মৃতপ্রায় রাধার এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা গোবিন্দদাস তাঁর পদে চিত্রিত করেছেন, শ্রীচৈতন্যের সেই ভাবমূর্ছিত নীলাচলবাসের সময়কে স্মরণ করে। ঠিক এমনি করেই স্বরূপ, গোবিন্দ ইত্যাদি পার্ষদগণ শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় জ্ঞান ফিরিয়ে আনতেন কৃষ্ণ নামের দ্বারা।

জ্ঞানদাসের পদেও শ্রীচৈতন্যের চিত্ররূপ পাই—

"আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥"

রাধার অভিসার বর্ণনা প্রসঙ্গে গোপন যাত্রার কথা বিস্মৃত হয়ে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য যখন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীদলকে নিয়ে নগরকীর্তনে বের হতেন এবং ভাবাবেগের আতিশয্যে সঙ্গীসাথীদের গায়ে হেলে পড়তেন—কবি অজ্ঞাতসারে সেই চিত্রই এঁকেছেন। রাধার অভিসার কখনও এত আড়ম্বর-সহযোগে প্রকাশ্যভাবে ঘটা সম্ভব নয়। কিংবা মাথুরের পদে রাধার যে চরম অবস্থার কথা জ্ঞানদাস বর্ণনা করেছেন সখীর মাধ্যমে, তা সম্পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার শেষ পর্যায়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

"খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তনি গদগদ ভাস॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবন মানয়ে ভার॥"

এবার আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের চারজন প্রধান কবির কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি। চণ্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"চণ্ডীদাস সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি। তিনি যেসব কবিতা লেখেননি, তার জন্যই কবি। অর্থাৎ তিনি এক ছত্র লেখেন আর পাঠককে দিয়ে দশ ছত্র লিখিয়ে নেন।" তাই মনে হয় চণ্ডীদাসের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠগুণ সরলতা; একেই আলংকারিকেরা বলেছেন প্রসাদগুণ। কবি প্রাণের গভীরতম আকুতিকে সরলতম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালের অনেক কবি সরলভাবে লেখার চেষ্টা করেও এতখানি সার্থকতা লাভ করতে পারেননি। চণ্ডীদাস অতি সামান্য সরল সহজ কথায় একেকটা ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এটা সামান্য কবিপ্রতিভার পরিচয় নয়। যেমন—

"এ-ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে।
আঙিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

চণ্ডীদাসের দ্বিতীয় গুণ গীতিধর্মিতা ও চিত্রধর্মিতা। অল্প কথায় চণ্ডীদাস

একেকটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, যা জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে। যেমন রাধিকা যখন যমুনার তীরে শ্যামকে দেখে তাঁর রূপের কথা ভেবে একা বসে বসে কাঁদছেন, তখনকার ভাবতন্ময়তার চিত্র চণ্ডীদাস অপূর্ব ব্যঞ্জনার দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন—

"নিজ কর পর রাখিল কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥

চণ্ডীদাস যেখানে আদর্শ প্রেমের কথা বলতে চেয়েছেন, সেখানে তা তত্ত্ব হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, কাব্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পূর্বরাগের চিত্রাঙ্কনে কবির বর্ণনা বহু জায়গায় আমাদের মনে ছবির মতো গেঁথে থাকে। চণ্ডীদাসের মতে, প্রেম কঠোর সাধনা। হৃদয়ের তুলাদণ্ডে মেপে দেখলে প্রাণের চেয়ে প্রেম হলো অধিক। বিদ্যাপতির কাব্যে ভাষার মাধুর্য বর্ণনার সৌন্দর্য পাই, চণ্ডীদাসের কাব্যে আবেগের গভীরতা পাই। রবীন্দ্রনাথের মতে, গতি ও উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই রকম দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের নৃত্য এবং চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, দাহ এবং আলো। চণ্ডীদাস বলেন, প্রেমে দুঃখ আছে বলেই প্রেম ত্যাগ করবার নয়। প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্তই দুঃখের যন্ত্রে নিঙড়ে নিয়ে বের করতে হয়। বৈষ্ণবের ধর্ম ভালবাসার ধর্ম। তাতে মুগ্ধ হয়ে সৌন্দর্যতত্ত্বজ্ঞ চণ্ডীদাস সৌন্দর্যের আদর্শ বেঁধে রেখেছেন। শুধু রাধার দেহের লাবণ্য বর্ণনাই নয়, কৃষ্ণের রূপযৌবন বর্ণনায়ও কবি স্বাভাবিক চাতুর্য দেখিয়েছেন। এই রূপলাবণ্যকে দেখে রাধার প্রেমের যে আর্তি, তাকে অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন কবি। শ্যামের নাম শুনেও রাধা কাতর—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এই অবস্থাকে উপমা প্রয়োগের নৈপুণ্যে আরও জীবন্ত ক'রে তুলেছেন কবি—

"কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।"

চণ্ডীদাসের রাধা এক অপরূপ সৃষ্টি। রাধার পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে বংশীধ্বনিতে। তার মন তখন পরিণত, প্রেমে সে প্রৌঢ়া। সে কিশোরী নয়। 'নহলী' যৌবনও নয়, সে পূর্ণ যৌবনা রাধিকা। তাই রাধা প্রেম সাধনায় নিমগ্ন। এই কৃচ্ছ্রসাধনায় রাধা যেন প্রাকৃত জগৎ থেকে অপ্রাকৃত লোকে প্রয়াণ করেছে—

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥"

কৃষ্ণের দিক থেকেও পূর্বরাগে কম আর্তি প্রকাশ পায়নি। সুবল সখার কাছে রাধাকে পাবার আকুলতায় কৃষ্ণ বলেছেন—

"যরি কোন্ বিধি আনি সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে॥"

রাধা প্রেমের আর্তিতে কৃষ্ণের সঙ্গে একদেহে লীন হয়ে যেতে চায়। রাধা বলছে, কৃষ্ণ যদি আমার অঙ্গে মিশে যেত, তাকে আমি হৃদয়ে রেখে দিতাম, কাজল হলে চোখে দিতাম, ফুল হলে খোঁপায় দিতাম, চন্দন হলে সারা অঙ্গে মাখতাম। কিন্তু এ প্রেমের রূপ দেহতেই পরিসমাপ্তি লাভ করেনি, দেহাতীত প্রেমে উন্নীত হয়েছে—

"বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।"

এ প্রেম তো দেহকে চায় না, এ প্রেম চায় একাত্মমনে সাধনা। এ প্রেম শুধু চাতক পাখীর মতো হাহাকার করে না, এ প্রেম বলে—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি॥"

এই তিন ভুবনে তার নিজের বলতে কেউ নেই, তাই কৃষ্ণের চরণেই তার আত্মসমর্পণ ও আত্মবিস্মরণ।

চণ্ডীদাসের কবিতার সম্যক স্ফূর্তি দুঃখবিরহের বর্ণনায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হয়ে পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নেই। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলে জেনেছেন। বিদ্যাপতি ভোগের কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখতে পান। চণ্ডীদাসের প্রেম "কিছু কিছু সুধা বিষগুণ আধা"। তাঁর কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাও বিষামৃতে একত্র ক'রে। তাইতো তাদের মিলনে "দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

ক্ষণকালের মিলনের পর যে বিচ্ছেদ তাকে বলে আক্ষেপানুরাগ। আক্ষেপানুরাগের পদরচনায় চণ্ডীদাস সমান মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এই পদগুলিতে রাধার অন্তর্দাহের আর্তি অত্যন্ত সংযত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

"কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।"

রাধার প্রেমানুরাগের ব্যাকুলতাও দুঃখের মধ্যে। দুঃখের গভীরতা দিয়ে কবি রাধার প্রেমের গভীরতার পরিমাপ করেছেন। নিজের হৃদয়কে—

"যত নিবারয়ে পায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানুপথে ধায় রে।"

এই আক্ষেপকে এবং কৃষ্ণের সঙ্গে সাময়িক মিলনের পর সাময়িক বিচ্ছেদ, তাকেই রাধা প্রকাশ করেছেন এবং সমস্ত জগতের প্রতি তার মন যেন বিরূপ হয়ে উঠেছে। এই আক্ষেপানুরাগ কত সহজভাবে কত সরল কথায় কি গভীর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে—

"কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব নন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা॥

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মূরছা হইবে সহজে কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কহে তবে সে জানিবে পিরীতি কেমন জ্বালা॥

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি সত্য, কিন্তু তাঁর প্রেমের চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে দুঃখের অশ্রু। কবির কথায় "পিরীতি রসের রসিক নহিলে কি ছার জীবনে তার"। আবার বলছেন "পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে পিরীতি গড়ল কে"। চণ্ডীদাসের এই 'পিরীতি' শব্দটির কমনীয়তা এবং মাধুর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের চাতুর্যে আরও মনোরম হয়ে উঠেছে। কবি বহুস্থলে পিরীতিকে আস্বাদন করতে গিয়ে বিষাদের হাহাকারে তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন—"মধুর বলিয়া যতনে খাইনু তিতায় তিতিল দে।" প্রেমের মাদকতায় রাধা বিহ্বল হয়ে পড়ে কৃষ্ণের বিমুখতা দেখে আক্ষেপ প্রকাশ করেছে—

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥"

এই প্রেমের আর্তি বহু কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করেও রাধা শ্যামের অনুভব থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। কালো কিছু দেখলেই বা শুনলেই কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে তার। এই প্রাপ্তিতেও সুখ নেই—

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে॥"

চণ্ডীদাসের এই প্রেম নরনারীর হৃদয়ানুভূতিকে আশ্রয় ক'রে রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সত্য, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত মানবের জয়গানে পর্যবসিত হয়েছে—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

ললিতা ও বিশাখা সখীদ্বয় চণ্ডীদাসের কবিকল্পনার সৃষ্টি। যেমন দেখি কালিদাসের শকুন্তলায় দুই সখী। চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভায় স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ

হৃদয়ের গভীরতম স্তর থেকে উৎসারিত। তাই তার প্রকাশও এত সহজ এবং সরল। বাঙালীর প্রাণের কাছে তার আবেদন এত গভীরভাবে পেঁ ছেছে বলেই তিনি বাঙালীর এত প্রিয় কবি।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের কাব্যরচনায় অন্তরালে যে প্রেরণা ছিল, তা শ্রীচৈতন্যের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনের প্রেরণা। কিন্তু বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি ব'লে স্বাধীন কবিপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর ওপর ভাগবতের খানিকটা প্রভাব পড়েছে বটে, তবুও কবিস্ফূর্তির প্রকাশই সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পেছনে কোনও ধর্মের তত্ত্ব নেই।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা সবাই ছিলেন বৈষ্ণব এবং এই ধর্মবিশ্বাসের আওতায় থেকে তাঁরা পদ রচনা করেছেন। এর ফলে রাধাকৃষ্ণ পদাবলী বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ভিন্ন তাঁরা আর কিছু রচনা করতে পারেননি। কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু রাধাকৃষ্ণের পদই লেখেননি, অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন, কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা ইত্যাদি। এর থেকে সহজেই মনে হয়, তাঁর মধ্যে অবিমিশ্র বৈষ্ণবতার প্রেরণা কার্যকরী ছিল না। শুধু কৃষ্ণের প্রতি বিদ্যাপতির অনুরাগ ছিল না, দুর্গা, মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিও তিনি স্বীয় হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কারোর কাছে মাথা নত করেননি।

বিদ্যাপতি যে পদ রচনা ছাড়া অন্যান্য বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, এর দ্বারা তাঁর জ্ঞানের বিচিত্রতা ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। পাণ্ডিত্যের বিচারে যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তেমনি বৈচিত্র্যের বিচারে বিদ্যাপতি অতুলনীয়।

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। রাজসভার পরিবেশ অবিমিশ্র ভক্তের পরিবেশ নয়। তাই ভক্তহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের চেয়ে এখানে রাজকর্মচারীদের আনন্দবর্ধনের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গির পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। কবিত্বের যতই উচ্চমার্গে তিনি আরোহণ করুন না কেন, এই চটুলতা রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অলংকার শাস্ত্রের বিধিনিষেধ

তিনি পদে পদে মেনে চলেছেন বটে, এই নিষেধ মানার মাপা পথেও তিনি কবিপ্রতিভার উচ্চতম বিকাশ দেখিয়েছেন। এই স্বাধীন কবিপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে বিদ্যাপতি পদ রচনা করেছেন বলেই অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবীর মালিন্য থেকে ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মস্তরে যেতে পেরেছেন। তাই বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণকে বাদ দিয়েও লৌকিক নরনারী হিসেবে পদগুলিকে আস্বাদ করা যায়। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা আধ্যাত্মিক স্তরে উঠেই পদ রচনা করেছেন ব'লে কবিপ্রেরণার পেছনে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে। অলৌকিক রসের আস্বাদনই তাঁদের লক্ষ্য।

বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায়, রূপকে স্বীকার ক'রে নিয়ে অপরূপকে আস্বাদন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতাতেও দেখা যায় এই একই রীতি। তাই বৈষ্ণব প্রেমকবিতার সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতার মিল রয়েছে। বিদ্যাপতির রচনাতেও এই রূপের আধারে অরূপের মধুপান লক্ষ্য করা যায়। এদিক দিয়ে বিদ্যাপতি সার্থক প্রেমের কবি। আবার যেখানে লৌকিক সীমাকে অতিক্রম করেছেন কবি, সেই অলৌকিক স্তরে গিয়েও বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে বিদ্যাপতির কবিতার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এর ফলে বিদ্যাপতির মধ্যে বৈষ্ণব-প্রাণতারও প্রমাণ মেলে।

ভাব-সম্মিলন শ্রেণীর পদরচনায় বিদ্যাপতি পথপ্রদর্শক। কিন্তু নিছক কবিপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে এবং যথার্থ বৈষ্ণব না হয়েও বিদ্যাপতি যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, চৈতন্য-পরবর্তী পদকাররা আধ্যাত্মিক প্রেরণায় বশবর্তী হয়েও সেই স্তরেই পৌঁছেছেন। তাই একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যদেব, অন্যদিকে তেমনি গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা বিদ্যাপতির পদাবলী আস্বাদন করেছেন।

অভিসার, মাথুর ও ভাব-সম্মিলন পদরচনায় যখন বিদ্যাপতি পার্থিব মালিন্য থেকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে পৌঁছেছেন, সেই সব পদগুলিতেই পরবর্তী ধারার সঙ্গে তিনি যেন সেতু রচনা করেছেন এবং আমাদের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির এই শ্রেণীর পদাবলী-ই আস্বাদ করতেন। বয়ঃসন্ধি শ্রেণীর পদ রচনায় তিনি

সার্থকতা দেখালেও বৈষ্ণব সাধকেরা যে এই শ্রেণীর কবিতা আস্বাদন করতেন না, তা অনায়াসে বলা যায়। অলংকার শাস্ত্রের যথাযথ রীতি মানতে গিয়ে বিদ্যাপতি ক্ষণিক বিরহের বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বটে, কিন্তু মাথুর বিরহে সমস্ত বিধিবদ্ধতাকে লঙ্ঘন ক'রে স্বাধীন কবিপ্রতিভার স্পর্শে তা ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন পেয়েছেন।

মাথুর বিরহে বিদ্যাপতি সমস্ত কবিরীতিকে অতিক্রম ক'রে মর্মস্থল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবপ্রকাশের আকৃতিতে কবিত্বের কৈলাস শিখরে উঠেছেন। বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ক্ষণমাত্রও সইতে পারতেন না। কৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদের আশংকায় রাধিকা তাঁর বক্ষে বসন, চন্দন এবং হার পরতেন না। মিলনে যাঁর এমনি আগ্রহ, বিচ্ছেদের আশংকা যাঁর এত প্রবল, সেই রাধিকার প্রিয়তম কৃষ্ণ আজ কত নদী গিরির ব্যবধানে অবস্থান করছেন—

> "চির চন্দন উরে হার না দেলা
> সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা।"

রাধিকার এই দুঃখ সীমাহীন। কৃষ্ণ বিরহে রাধা যেন সম্পূর্ণ নিরলম্ব অবস্থায় অধিষ্ঠিতা—

> "শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
> শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী।"

একটা অতীন্দ্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা ভাব-সম্মিলনের পদগুলিতে মিলনানন্দের রসসঞ্চার করেছেন। শ্রীমতী যেন দীর্ঘ বিরহের তপস্যায় তাঁর প্রেমাস্পদকে চিরদিনের জন্য অন্তরলোকে লাভ করেছেন। আর তাঁর উদ্বেগ, লোকভয়, বিরহ কিছুই নেই। তিনি যেন শান্ত, সমাহিত চিদানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। "কি কহব রে সখী আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

শ্রীমতী তপস্যার অনলে দৈহিকতাকে লোপ পাইয়ে বিদেহী প্রেমের দিব্যানন্দে

আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই এখন মদনের পাঁচবাণ লাখবাণই হোক, আর লক্ষ কোকিল ডাকুক, তাতে শ্রীমতীর চিত্ত আকুল হয় না।

বিদ্যাপতির রাধার আত্মিক মিলন এত গভীর ভাবসমৃদ্ধ এবং সুকৌশল-প্রযত্ন যে যখন শ্রীরাধা বলছে—সখী, আমি গত রজনী কি ভাগ্যেই না অতিবাহিত করেছি! কেননা আমি স্বপ্নে আমার প্রিয়তমের চাঁদমুখ দেখেছি, আমার জীবন-যৌবন সমস্তই আজ চরিতার্থ। সমস্ত সংশয়ের কুহেলিকা, দুঃখের ঘনঘটা কেটে গিয়ে দশদিক আজ প্রসন্ন—

"আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

তা না হলে আমার গৃহ, আমার পরিজন কোনও কিছুরই তো সার্থকতা নেই।

এসব থেকে মনে হয়, কবি বিদ্যাপতির মধ্যে বিধিবদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম অপেক্ষা স্বাধীন কবিপ্রতিভার স্ফূর্তি দেখা যায়। তবে এটাও সত্য যে এই প্রেরণা আধুনিক কালের মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের মতো নিছক কবিপ্রেরণাও নয়। এর পেছনে যে বৈষ্ণবপ্রাণতাও ছিল তার উল্লেখ আগেই করেছি। মাধবের প্রতি যে আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, প্রার্থনা-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে, যে বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে বৈষ্ণবপ্রাণতা না ব'লে নিছক কবিপ্রেরণা বলা ঠিক নয়। এই বৈষ্ণবপ্রাণতা বিদ্যাপতি পেয়েছেন খানিকটা জয়দেবের কাছ থেকে। রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার কাহিনী জয়দেব পেয়েছেন পুরাণ ভাগবত থেকে। তাই বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণবধারার বাইরে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা চলবে না।

এবার আমরা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কবিকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

জ্ঞান দাসের পদাস্বাদন করতে গিয়ে প্রথম থেকেই মনে হয়, দুটি অনিন্দ্যসুন্দর শিশু কিভাবে ক্রমশঃ কিশোরকিশোরী হ'য়ে ওঠে, তারপর যৌবনে পদার্পণ ক'রে

রচয়িতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। জ্ঞানদাস শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করেছেন সেই বাল্য অবস্থা থেকে, যে রূপের অবলম্বনে ভাবী রসবতী নায়িকার প্রেম-বিহ্বলতার ইংগিত পাওয়া যায়।

"চল চল কোবিত কাঞ্চন তনু গৌরী।
ধরণী পরিছে নব যৌবন হিলোলি॥"

বালিকা রাধিকা তখনও শৈশবসুলভ ক্রীড়ায় মত্ত। অন্যদিকে কৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের নিয়ে মগ্ন।

যৌবনপ্রাপ্তা। যমুনাপথে যেতে যেতে এক রসিকরাজকে দেখে শ্রীমতীর মনে বিকার জন্মেছে। শ্রীমতীর অন্তরে যে অদম্য কলরোল চলেছে, তা বাইরে প্রকাশ করা যায় না; অথচ ক্রমশঃ যেন বহির্জগৎ সম্পর্কে উদাসীনতা দেখা দিয়েছে। একটা অর্ধচেতন অবস্থার মধ্য দিয়ে নবপ্রেমের অংকুরকে শ্রীরাধা সঞ্জীবিত করছেন। সখিগণ কোনও কারণ খুঁজে পায় না রাধার এই অভিনব চিত্তবিভ্রান্তির। সংস্কারবশে তারা ভাবে একাকিনী যুবতী রূপসী বোধহয় কোনও অপদেবতার দৃষ্টিকোপে পড়েছে যমুনার পথে। কিন্তু জ্ঞানদাস এর প্রকৃত কারণ জানেন। অবশেষে শ্রীমতীর বাক্যস্ফুরণ হয়—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার জাতিকুল মর্যাদার কথা মনে পড়ে। কুলবতী সতী হয়েও তার বর্তমান অপ্রতিরোধনীয় চিত্তবিকার দ্বারা সে যে পিতৃকুল এবং স্বামিকুলে কলঙ্ক লেপনে প্রয়াসী হয়েছে। এমনিভাবেই একসময় শ্রীরাধার আত্মসচেতনতা ফিরে আসে সামাজিক পরিবেশে। কিন্তু পুষ্পশরের আঘাত রাধাকে সমাজ, সংসার, প্রিয়জন মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দেয়। শ্রীমতী কোনোপ্রকারেই নিজের মনকে নিরস্ত করতে পারে না। রূপমুগ্ধা রাধা বলে—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥"

গুরুজনের কটাক্ষ ইংগিতে সচেতন হয়েও শ্রীরাধা শ্যামনাম শ্যামবরণ প্রসঙ্গে চিত্তচাঞ্চল্যকে সংযত করতে পারে না। শ্রীরাধা যাঁর সাধনায় মগ্ন সেই কৃষ্ণ এমন নিষ্ঠুর হয়ে রইলেন কেন? রাধা জীবনে বৈপরীত্যময় ফলশ্রুতি দেখে নিরাশ হয়ে বলেছে—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥"

চণ্ডীদাসের কবিতায় যেমন ভাবের কথাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে, জ্ঞানদাসের কবিতাতেও বর্ণনায় প্রাঞ্জলতা এবং স্বভাবোক্তি অলংকারের দ্বারা অন্তরের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আছে। অলংকারের সাহায্য না নিয়ে এবং ভাষার ফেনিল উচ্ছ্বাসকে বর্জন ক'রে জ্ঞানদাস তাঁর কাব্যে বিভিন্ন অনুভূতিকে বিভিন্ন পরিবেশে চিত্তের আকুলতাকে মর্মস্পর্শী ক'রে প্রকাশ করেছেন। সেজন্য পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং নিবেদনের পদে জ্ঞানদাসের কাব্যে চরমোৎকর্ষ দেখা যায়। গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের পদগুলিতে প্রতি পদে যথেষ্ট শিল্পচাতুর্য ও সূক্ষ্ম অলংকারের সমাবেশ থাকলেও জ্ঞানদাসের পদের মত তা ভাবগভীরতায় সহজেই মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠেনি। জ্ঞানদাসের পূর্ব-রাগের পদ অতিসহজেই মনের তন্ত্রীতে আঘাত করে। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদন করবার জন্য ছন্দে, অলংকারে, ভাষা ও শিল্পকৌশলে সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা দরকার।

জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদগুলিতেও প্রাঞ্জল ভাষায় অন্তরের গভীরতাটুকু প্রকাশ পেয়েছে—

"শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণ পরাণ নেহা।

না জানি কি লাগি কো বিধি গড়ল
তিন তিন করি দেহা ॥"

নিবেদনের পদে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন—

"তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।"

জ্ঞানদাস শ্রীগৌরাঙ্গকে অবলম্বন ক'রে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা আস্বাদ করতে চেয়েছেন। পরিপূর্ণভাবে শ্রীরাধার ভাবতন্ময়তার নির্যাসে শ্রীচৈতন্য কায়াময় হয়েছেন।

পদরচনায় কোনও কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে ঘটনার উপস্থাপনায় কবি অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে কত সহজভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন জ্ঞানদাসের মত স্বভাব কবিরাই। অলংকার সজ্জাতেই কোনও রচনা শ্রেষ্ঠ হয় না। তাই কবি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের মত না হলেও শুধু কাব্যদেহের নয়, একেবারে অন্তরের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত ক'রে অলংকার প্রয়োগ ক'রে সৌষ্ঠব সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। অলংকারকে পদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বাহন ক'রে তোলবার এমন নিখুঁত নিপুণতা জ্ঞানদাসের ছিল বলেই পদকর্তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভাধর হয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছেন।

বিদ্যাপতির পদের উল্লাস বা সম্ভোগরস ও চণ্ডীদাসের বিরহের রস এক সঙ্গে আত্মসাৎ ক'রে জ্ঞানদাস আপন মৌলিকতা রক্ষা করেছেন। ভাবসম্মিলনের পদে কি গভীর দৃঢ়তা, কত আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে, যখন শ্রীমতী বলছে—

"বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব।"

জ্ঞানদাসের মাথুর বর্ণনা শ্রীমতীর অশ্রুধারার এক একটি স্বচ্ছ মুক্তাবিন্দু। সেদিনের রাধার অবিশ্রান্ত অশ্রুর ঢেউ মথুরার পাষাণপ্রাচীরে ব্যাহত হয়ে

ফিরে আসে এবং তার সেই ব্যর্থ হাহাকার জ্ঞানদাসের হৃদয়রসে আপ্লুত হয়ে বাঙালীর বিরহীমনের শাশ্বতলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতিদুঃখেই শ্রীমতী বলছে, মাধব তাঁর শপথভঙ্গ করেছেন। আজ কাল ক'রে কত দিন যে গত হয়ে গেল—

"দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখ কত ভেল।
আওব করি করি কত পরবোধ
অবজীব ধবই না পাব।"

কাব্যবিচারে ভাবই যেখানে একমাত্র বস্তু নয়, বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যের প্রকাশভঙ্গী যেখানে যথেষ্ট মূল্যবান, অনুভূতির আকুলতা জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ-দাসের কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হলেও রচনাভঙ্গীর সঙ্গে আন্তরিক আবেগের সামঞ্জস্য বিধানের ফলে উভয়ের পদাবলী যথেষ্টই রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

গোবিন্দদাসের কাব্য নিছক ভাবাকুল চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। "তিনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু প্রগাঢ় ভক্তিকে সংযত ক'রে শিল্পোচিত কবিধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। ভাবানন্দকে বোধানন্দের সঙ্গে যুক্ত ক'রে পদ রচনাকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন গোবিন্দদাস।" গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, কাব্যের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনের নিখুঁত রূপটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা কবি গ্রহণ করেছেন, ভাবোচ্ছ্বাসে সব কিছু ভেসে যায়নি। যেমন—

"চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনমোহন ভাঙনি রে॥"

গোবিন্দদাস সচেতন কাব্যশিল্পী ছিলেন বলেই হয়ত সংস্কৃত অলংকারের প্রভাব

তাঁর কাব্যে খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীও সচেতন সৃষ্টির ফলস্বরূপ। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে তাঁর কাব্যের গুরু ব'লে শ্রদ্ধা করেছেন এবং ছন্দবৈচিত্র্যে, পদবিন্যাসের চাতুর্যে ভাবপ্রকাশের কৌশলে এবং অলংকরণের সৌকুমার্যে শিষ্য গোবিন্দদাস গুরু বিদ্যাপতিকেও কখনো কখনো ছাড়িয়ে গিয়েছেন। "উপমা যদি কালিদাসস্য হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা গোবিন্দদাসস্য বলতে হয়।" গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির মতো সম্ভোগের এবং উল্লাসরসের কবি। "সৌন্দর্যকে যদি নিরবলম্বভাবে দেখা সম্ভব হয়, দেহবিমুক্ত তত্ত্বগত সৌন্দর্যকে রাধা চরিত্রের ওপর আরোপ ক'রে গোবিন্দদাস কাব্যে রাধাচিত্রের অবতারণা করেছেন। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার Abstract Beauty অর্থাৎ অনির্বচনীয় লাবণ্য একটা ভাববিগ্রহরূপে প্রতীয়মান হয়। গোবিন্দদাসের মানসতুলিকাতে রক্তমাংসের দেহধারী রাধার পরিকল্পনা লোপ পেয়েছে। অন্তরের অনন্ত সৌন্দর্যলোক বহির্মুখী হয়ে এক শ্রীরাধার রূপকল্পনায় কেন্দ্রায়িত।"

বিভিন্ন অবস্থায় প্রেমের স্বরূপ নিরূপণ করায় গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্য চরমোৎকর্ষতা লাভ করেছে। কেবল প্রেমবৈচিত্ত্যই নয়, প্রেমের অতলস্পর্শ গভীরতা যা জীবনের অন্য সব কথা ভুলিয়ে দেয়, গোবিন্দদাসের কবিতায় তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

কবির অভিসারের পদরচনার বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মাভিসার, বর্ষাভিসার, হিমাভিসার, দিবাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার প্রভৃতি অসংখ্য পরিবেশের সৃষ্টি গোবিন্দদাস করেছেন। তাঁর অভিসারের পদে মানবীয় এবং: ভগবৎপ্রেমের আকুলতায় অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। সমসাময়িক কবিদের তুলনায় গৌরচন্দ্রিকার পদরচনায় গোবিন্দদাস সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। "তিনি শ্রীচৈতন্যকে চোখে দেখেননি, কিন্তু গভীর অনুভূতির সঙ্গে শিল্পধর্মের অপরূপ মিল ঘটেছে গোবিন্দদাসের রচনায়। অলংকারপ্রিয়তার জন্য বিরহের পদে জ্ঞানদাসের মতো গভীর আর্তি বা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার প্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটেনি বটে, কিন্তু মাধুর্য রসের লীলা অবলম্বনে রসবৈচিত্র্যের সৃষ্টিকার্যে

গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়। সংস্কৃত সাহিত্য এবং জয়দেব বিদ্যাপতির অনুসরণ কবির পক্ষে ঘটে থাকলেও অলংকরণের চারুত্ব সংগীতের আভাসে প্রাণুভাসিত হয় যে মৌলিক কবিপ্রতিভার স্পর্শে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় গোবিন্দদাসের কাব্যে আমরা পাই।"

আমরা আগেই বলেছি, পদাবলী সাহিত্যে অভিসারের পদ রচনা ক'রে যেসব পদকর্তারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন, গোবিন্দদাসের নাম তাঁদের সর্বাগ্রে। "যে নায়িকা মন্মথ বশীভূত হয়ে কান্তকে নিজের কাছে আনয়ন করে অথবা যে নায়িকা নিজেই কান্তের কাছে গমন করে, ধীর ব্যক্তিরা তাকেই অভিসারিকা বলেন।" মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবি গোবিন্দদাস অভিসারের পদরচনায় অনন্য-সাধারণ বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। এজন্য গোবিন্দদাসকে 'অভিসারের কবি' বলা হয়। গোবিন্দদাসের রাধা কখনও সজ্জিতা হয়ে, কখনও বা অসংগত বেশবাসে অভিসারে যাত্রা করেছেন। গোবিন্দদাসের অভিসার বিষয়ক পদগুলি বিশ্লেষণ করলে কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য জানা যাবে।

শ্রীরাধা গৃহে থেকেই দুস্তর পথ অতিক্রমের কৃচ্ছ্রসাধনাকে অভ্যাস দ্বারা জয় করবার চেষ্টা করছে। কারণ রাধাকে তো তার কান্তের কাছে পৌঁছোতে হবেই। অবিরত বাঁশীর আহ্বান রাধাকে উতলা করেছে। ভয়, বিপদ, লোকলজ্জা পরিজননিন্দার আশংকা থাকা সত্ত্বেও রাধা যথাবিধি কৌশল এবং সাবধানতার আশ্রয় নিয়ে যাত্রায় উপায় নির্ধারণ করেছে। কণ্টকময় পথে অভিসারে যেতে হবে, তাই শ্রীরাধা বাড়ির আঙিনায় কাঁটা পুঁতে পদ্মের মত কোমল চরণের নূপুর বস্ত্র দিয়ে ঢেকে চলার অভ্যাস করছে, পাছে নূপুরের শব্দ তার গোপন অভিসার ব্যর্থ করে। তারপর শ্রীরাধা কলসীর জল ঢেলে পথ পিচ্ছিল ক'রে আঙুল চেপে চলবার অভ্যাস করছে।

"মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।"

অন্ধকারে পথ চলায় অভ্যাস করছে সে চোখ ঢেকে পথ চলে। অন্ধকার পথে ভুজগ দ্বারা যদি আক্রান্ত হয়, এজন্য সাপের মণিমুখ কিভাবে বন্ধ করতে হয় তা হাতের কঙ্কণ পুরস্কার দিয়ে রাধা সাপুড়েদের কাছ থেকে শিক্ষা করছে। এই অবস্থায়—

"গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই"
—গোবিন্দদাসই তার সাক্ষী।

এই পদের মধ্যে এমন একটা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আছে যে শুধুই তা সমস্ত অভিসার বিষয়ক পদগুলিকে লোকোত্তর মহিমা দান করেছে। রাধাকৃষ্ণকে বাদ দিয়েও পদটিকে আস্বাদ করতে পারা যায়। কারণ পদটি লিরিক মাধুর্যে মণ্ডিত। যদিও বৈষ্ণবীয় পরিবেশ নিয়ে বিচার করলে পদটিকে লিরিক কবিতা বলে মনে হবে না। কেবল তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়, কাব্যের দিক দিয়েও পদটিকে বিশ্লেষণের দ্বারা গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তির অপূর্বত্ব নির্ণয় করা যায়।

বর্ষার দুর্যোগে শ্রীরাধা হরি অভিসারে যাত্রা করতে চলেছে—

"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই"

এমন দিনে রাধার প্রাণনাথ সংকেত কুঞ্জে গমন করেছেন। রাধা কি গৃহের মাঝে বসে সুখবিলাসে মগ্ন থাকতে পারে? তাকে যে যেতেই হবে। থেকে থেকে বাঁশীর গভীরতম আহ্বান রাধার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হচ্ছে। আজ ঐ বাঁশীর সুরে দোলায়মান চিত্তের চঞ্চলতা নায়িকার মনে ক্ষণে ক্ষণে আশংকার দোল দিয়েছে। সুকুমারী বালিকা এই দুরন্ত বর্ষায় এতদূর পথ অতিক্রম ক'রে আসবে কেমন করে? এদিকে সখীরাও শ্রীমতীকে বাধা দিয়েছে। এমন দুর্যোগে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার?

"সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার
হরি রহ মানস সুরধুনি পার।"

শুধু কি তাই? দশদিকে বিদ্যুতের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। প্রেমের জন্য কি দেহকে উপেক্ষা করতে হবে? রাধা তার উত্তরে বলছে, কুলমর্যাদারূপ কপাট যে উদ্ঘাটন করেছে, তার কাছে কাঠের কপাট তুচ্ছ; নিজের মর্যাদারূপ সমুদ্র যে পার হয়েছে, তার কাছে মানসগঙ্গা কতটুকু? মদনের কোটি কোটি শর যার ওপর বর্ষিত হচ্ছে, বারিধারার ভয়ে সে ভীতা হবে? যে বাণ ধনু ত্যাগ করেছে, সে বাণকে আর কি শত চেষ্টা ক'রেও ফিরিয়ে আনা যায়?

বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে কাব্যরসকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে দেয়। এমনিভাবেই গোবিন্দদাস শ্রীমতীর অনন্ত কৃচ্ছ্রসাধনাকে কী গভীর অনুভূতির দ্বারা হৃদয় মাধুর্যে আপ্লুত করেছেন। কবির পদের প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রেমিকা রাধিকার অভিসারের মধ্য দিয়ে প্রেমতপশ্চর্যার অপরূপ চিত্রায়ন।

এবার জ্ঞানদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর আক্ষেপানুরাগ বিষয়ক পদের কথাই মনে পড়ে। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানু-রাগের পদ বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যমণি। কবি জ্ঞানদাসকে আমরা চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলে থাকি। তাই জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদগুলিতেও আমরা তাঁর কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লক্ষ্য করি।

ক্ষণিক মিলনের পর শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে তার প্রগাঢ় প্রেমই প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীরাধা আক্ষেপ-অভিমান ক'রে বলেছে, সে অপাত্রে প্রেম নিবেদন করেছে। জ্ঞানদাসের পদ আলোচনা করলে দেখা যাবে, একদিকে গভীর আক্ষেপ, অন্য দিকে আক্ষেপ উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমের প্রকাশ—এই দ্বন্দ্ববৈপরীত্য যেখানে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব। একমাত্র চণ্ডীদাস ছাড়া এই শ্রেণীর পদরচনায় আর সব কবিকেই জ্ঞানদাস অতিক্রম করেছেন। এ জাতীয় মানসিক দ্বন্দ্ব বিদ্যাপতির পদেও দুর্লভ।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিযোগ ক'রে বলেছে, এবার সে কৃষ্ণের নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিচয় পেয়ে তার অন্তরের পরিচয়ও পেয়েছে। শিকার ধরবার জন্য

যেমন শিকারী খাদ্যের লোভ দেখিয়ে শিকারকে হস্তগত করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ নানা কৌশলে প্রেমের শৃংখলে তাকে আবদ্ধ ক'রে এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে অন্তর্ধান করেছেন। রাধার এতদুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে যে শ্রীকৃষ্ণকে খলরূপে বর্ণনা করতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু সব ছাপিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছে। মুখে কিন্তু বলছে—

"তোমার পিরীতি দেখিতে শুনিতে
যে দুখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা
তোমার পিরীতি রীতে।"

জ্ঞানদাস রাধার এই আপাত অভিমানের আক্ষেপোক্তির গোপন রহস্যটুকু টের পেয়েছেন। এই বিলাপ এক জাতীয় বিলাসেরই নামান্তর। শ্রীরাধার অভিযোগ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই সীমাবদ্ধ নয়। তার প্রেমের পথে যারা প্রতিবন্ধকতা করেছে যেমন শাশুড়ী, ননদিনী, প্রতিবেশিনী ইত্যাদি তাদের প্রতিও রাধা বিরূপ। শুধু তাই নয়, রাধা চোরের রমণীর মত জোর গলায় কাঁদতেও পারে না। এত দুঃখ বাধা শ্যামের প্রেমকে স্মরণ করেই তো রাধা সহ্য করেছে। কিন্তু শ্যাম যদি নিজেই "নিদারুণ" হন, তবে কি রাধার পক্ষে একথা বলা অসংগত?

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥"

শীতল বলে চাঁদের আলো সেবন করতে গিয়ে রাধা সূর্যকিরণে হলো দগ্ধ। অর্থাৎ প্রেমের স্নিগ্ধতা অপেক্ষা দাহটাই বড় হয়ে দেখা দিল। অথচ আসল যে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম, তাই অনবধানতায় হারিয়ে গেল। যে রত্ন পাবার আশায় সাগর নিয়ন্ত্রণ করা হল, নগর স্থাপন করা হল, অদৃষ্টের পরিহাসে

সাগর গেল শুকিয়ে, মাণিক গেল হারিয়ে। তৃষিত কণ্ঠে জলদ চাইতে বজ্রতাপই পেলাম। তবে শ্রীরাধা সব রকম কষ্টকেই সহ্য করে নিতে পারে, কিন্তু সহ্যের সীমাও অতিক্রম করে যখন—

"আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারই আঙিনা দিয়া।"

শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যত নির্লিপ্তই থাকুন না কেন, তাঁর সাক্ষাতেই যদি শ্রীকৃষ্ণ অন্যের প্রতি আসক্তা হয়ে পড়েন, তার চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কি হতে পারে? এখানে শ্রীরাধা কেবল ভালবেসেই তৃপ্ত নন, নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষুন্নতায় ম্রিয়মান। জ্ঞানদাসের হাতে শ্রীরাধার অপ্রাকৃত অস্তিত্ব এবং অপ্রাকৃত প্রেম এক সময় মাটির স্পর্শ পেয়ে সঞ্জীবিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক অনুলেপে প্রেম-লীলাকে সচেতনভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে জীবনরস-বিচ্যুত করবার ইচ্ছা জ্ঞানদাসের ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে কোনো কোনো পণ্ডিতব্যক্তি রোমান্টিক গীতকবিতা নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব পদাবলীর যে চিরন্তন সাহিত্য-মূল্য, তা মূলতঃ এই ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিকতার জন্য। এর ধর্মীয় এবং দার্শনিক মূল্য তাঁদের কাছে গৌণ। মানবিক প্রেমের চিরন্তন লীলা রাধাকৃষ্ণের রূপকে বৈষ্ণব কবিরা চিত্রিত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "বৈষ্ণব পদাবলীর রসগ্রহণ করিতে গেলে আমাদের বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইবার আবশ্যক নাই। মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলিক, সেই ভালো-লাগাকে চিরন্তন করিয়া ভালোবাসিবার ইচ্ছা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণার উৎস। পুরানো বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতা বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যে বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথ তাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন।" অলৌকিক জগতের কথা থাকলেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আমাদের মনে এক সৌন্দর্যলোকের সন্ধান দেয়। সে প্রেমের আকুলতা পৃথিবীর নায়ক-নায়িকার মতই আবেগমণ্ডিত। তাই বোধ করি কবির প্রশ্ন—

"হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে।…

এত প্রেম কথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে ?"

আবার অন্য একদল পণ্ডিতের মতে, রাধাকৃষ্ণের এই লৌকিক প্রেমলীলার চিত্র নিতান্তই বাইরের আবরণ। মূলতঃ তা' জীবাত্মা ও পরমাত্মার চিরন্তন লীলা। "উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনিই ভগবান। বৈষ্ণবেরা ভগবানের এই আনন্দময় সত্তার উপাসক।" এই নায়ক-নায়িকা জীবাত্মা এবং পরমাত্মারূপে লীলা করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা কৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সঙ্গে যখন লীলা করেন, তখন দ্বৈতভাব দূর হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, মিষ্টিকের উপলব্ধি অনুভূতিগ্রাহ্য ব'লে তাকে রূপ দিতে নানা ইংগিতের আশ্রয় নিতে হয়। এই প্রতীকের সাহায্যেই ভাবুক কবি অবাঙমনস-গোচর সেই সত্তাকে রূপময় করে তোলেন। জনৈক পণ্ডিত-সমালোচক বলেছেন, "প্রেমমনস্তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনে বৈষ্ণব পদাবলীকারগণ যে অপরূপ অথচ দুর্জ্ঞেয় উপলব্ধির স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, যে মিষ্টিক অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এক কথায় অভিনব। বৈষ্ণব কবিতা বৈকুণ্ঠের তরেই যে রচিত হয় নাই, মানব ও দেবের সেতুবন্ধনেই যে তাহার উৎপত্তি, ইহা আমরা অনায়াসেই লক্ষ্য করিতে পারি। তাঁহারা লৌকিক নরনারীর জীবনে যে প্রেম দেখিয়েছিলেন, তাহাই অলৌকিক রসাবেশে অমর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন এক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে।... অধিকাংশ বৈষ্ণব পদেই তাই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষ প্রবরের বাঁশীর সুরে এই মিষ্টিক চৈতন্যবাণী আমরা ধ্বনিত হইতে শুনিয়াছি।" কবি যখন বলেন—

"জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি।

কিংবা

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

অথবা

> "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

কিংবা

> "হাথক দরপণ মাথক ফুল।
> নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥"

তখন আমাদের মনে হয় সীমা এবং অসীমের অপরূপ লীলা-রহস্য এই সব পদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসকে তত্ত্বের শৃংখলে বেঁধে তাঁরা রোমান্টিক এবং মিষ্টিক রূপের মিলিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যখন তাকে লৌকিক রূপে বিচার করি, নর-নারীর প্রেমলীলার বিচিত্র বৈভবে যখন তা অপরূপ হয়ে ওঠে, সেই সৌন্দর্যমথিত পদাবলী রোমান্টিক। আবার বাইরের সমস্ত আবরণ ছিন্ন ক'রে যখন অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি পরম পুরুষের বিচিত্র লীলাকে আভাসিত ক'রে বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলাকে রূপায়িত করে অন্ততঃ সেই ইংগিতটুকু আমাদের চিত্তে সঞ্চার করে, সেই রহস্যময় চেতনার মুহূর্তে তা মিষ্টিক।

বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করলাম। যাঁরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাঠে উৎসুক, তাঁরা পণ্ডিত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর "বৈষ্ণব সাহিত্য", কালিদাস রায়ের "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য", ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের" ২য় খণ্ডের আলোচনা দেখে নিতে পারেন। পূর্বসূরীদের বিভিন্ন গ্রন্থের উপাদানই আমার এই আলোচনায় গ্রহণ করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য (যদিও পাঠ্যতালিকাভুক্ত) বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকাতেও উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনেছিল। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য সবই পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কবি কোনও রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করতেন। কিন্তু তা হস্তলিখিত পুঁথিতে

আবদ্ধ থাকতো বলে' কবি বেশিরভাগ সময়ে স্বকণ্ঠে তা পাঠ করে' বা গান গেয়ে শোনাতেন। এইভাবে গান গাইবার বা পাঠ করার সময়ে প্রত্যেকটি পদের শেষে কবিরা নিজেদের নাম জানিয়ে দিতেন। এই নাম জানানোর পদ্ধতিকে ভণিতা বলে।

কবিরা যে কাব্য রচনা করতেন ও পাঠ করে' বা গান গেয়ে শোনাতেন, কালের হস্তক্ষেপে সেই পুঁথি একদিন জীর্ণ হ'য়ে যেতো। কবির যিনি মূল গায়েন তাঁকে বা কোনও প্রিয় অনুগতকে কবি তাঁর পুঁথি নকল করবার নির্দেশ দিতেন। সেই নকলকারী কবির মূল পুঁথি নকল করতে গিয়ে অনেক সময়ে নিজের কবিত্ব ফলিয়ে কয়েক লাইন লিখে মূল কাব্যের নকলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন। কখনও-বা মূল কাব্যের কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিতেন। এইভাবে যোগবিয়োগ করে' পরবর্তী পুঁথি যেটা তৈরি হতো, সেখানে মূল কবির নিজের লেখার সঙ্গে নকলকারীর কিছু অংশ মিশে যেতো ও আসল কবির কিছু অংশ বাদ-ও যেতো। পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ মূল কবির তিরোভাবের পরে যিনি কবির বা গুরুর আসন গ্রহণ করতেন, তিনি সেই একইভাবে তাঁর অনুগত কাউকে জীর্ণ পুঁথি থেকে নকল করতে দিতেন। একই প্রক্রিয়ায় আবার যোগবিয়োগ হতো।

এইভাবে মূল কবির মূল পুঁথি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তী কালে এই নকল পুঁথি আসলের ভূমিকা নিত। তাই একই কাব্যের অনেক পুঁথি পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। গবেষকরা বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে মূল কাব্যের পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এইভাবে মূল কাব্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অংশকে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে।

মধ্যযুগীয় কাব্যাবলীতে এই প্রক্ষিপ্ত অংশের আক্রমণে 'নাস্ত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে যেতো। যেমন, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মূল পুঁথি পাওয়া যায় না.

বলে' কোন্ কোন্ অংশগুলি মূল কবির লেখা এবং কোন্গুলি-বা প্রক্ষিপ্ত অংশ, আজ তা নির্ণয় করা এক দুরূহ কর্ম। যত দিন না মূল পুঁথি আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন গবেষকদের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো স্বীকৃত পাঠকে মেনে নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই।

আবার যে কাব্য বা পদাবলী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা মুখে মুখে পরিবর্তিত রূপ পেয়ে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে—কখনও বা কিছু কিছু শব্দেরও পরিবর্তন ঘটেছে—যতদিন না ছাপার অক্ষরে তাকে বেঁধে রেখে কাব্যের রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক পদের ভাষা আধুনিক এবং কিছু কিছু পাঠভেদও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে চর্যাপদ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি অনাবিষ্কৃত ছিল বলে' যখন তা আবিষ্কৃত হলো, তখন ছাপাখানার দৌলতে অকৃত্রিমরূপে এই ভাষাকে বেঁধে রাখা গেল। কিন্তু কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আগে রচিত হলেও আধুনিক ভাষায় তার রূপান্তর ঘটেছে ; তার জনপ্রিয়তার জন্যই এই ভাষান্তর সম্ভব হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক

১

আজিকার স্বপনের কথা শুন লো মালিনী সই[১]
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে[২]।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে ॥
ঘরেতে শুতিয়াছিলাম[৩] অচেতনে বাহির হৈলাম[৪]
নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞা।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া ॥
তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল ॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির[৫] নাহি বাঁধে
কি করিব কহ না উপায়।

বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি সদা দেখ তায় ॥

১। মালিনী শ্রীবাসের স্ত্রী ও শচীদেবীর অন্তরঙ্গ সখী ছিলেন। এই শ্রীবাসের আঙিনায় মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিতে ভাবোন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য করতেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুরও অন্তরঙ্গ অনুরাগী ছিলেন, যদিও বয়সে তিনি শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা বড় ছিলেন। ২। সন্ন্যাসের পর গৃহত্যাগ করলে শোকার্ত মাতা শচী দেবী স্বপ্নে নিমাইকে দেখে আকুল হয়ে উঠেছেন। ৩। শুয়ে ছিলাম; ৪। ঘুমের ঘোরে বাইরে এলাম; ৫। হৃদয় স্থির হয় না; ৬। পদকর্তা সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, নিমাই একান্ত তোমারই বলে' তাকে স্বপ্নে দেখা পাচ্ছ।

২

আজু হাম কি পেখলুঁ[১] নবদ্বীপচন্দ[২]।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব[৩] ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ[৪]।
খেনে খেনে[৫] ফুলবনে চলই একান্ত[৬] ॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ[৭] ॥
পুলক-মুকুলবর[৮] ভরু[৯] সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ[১০] ॥

১। দেখলাম; ২। নবদ্বীপের চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গকে; ৩। হাতের ওপর মুখ রেখেছেন; ৪। ঘর ও পথ (একবার ঘরে যাচ্ছেন, আবার বাইরে বের হচ্ছেন। তুলনীয়: চণ্ডীদাসের পদ—"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।"); ৫। ক্ষণে; ৬। একা একা; ৭। প্রকাশ; ৮। পুলকজাত রোমাঞ্চ—পুলকে সমস্ত দেহ যেন শিহরিত হয়ে উঠ্‌ছে; ৯। ভরে উঠ্‌লো;

১০। থৈ পেলেন না। পদকর্তা রাধামোহন এসবের কিছুরই থৈ খুঁজে পেলেন না অর্থাৎ গভীর প্রেমসাগরের উপলব্ধি হলো না। তুলনীয় : চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ-অন্তর্গত রাধাভাব সম্বলিত পদ।

৩

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে[১] অরুণ-বসন পরে[২]
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ[৩]।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায়[৪] পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জিয়ে[৫] পরাণে।
বহিছে তপত ধারা[৬] যেন মন্দাকিনী পারা[৭]
মুকুন্দের[৮] ও-দুই নয়ানে॥
সকল মোহান্ত-ঘরে বিধাতা[৯] বুঝাইয়া ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন[১০] রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ[১১]॥
কি কব দুখের কথা কহিতে মরম-ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া[১২]।
দিবানিশি নাহি জানি[১৩] বিরহে আকুল প্রাণী
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া[১৪]॥

এই পদে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পরিচয় জেনে ভক্তবৃন্দ পার্ষদসহ সকলে কাতর হয়ে পড়েছেন—তারই চিত্র। ১। সন্ন্যাসীর অপরিহার্য দণ্ডী

এই লাঠি; ২। এখানে গেরুয়া বসন পরিধান করা বোঝান হয়েছে; ৩। ন্যাড়া মাথা হয়ে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রচলিত বিধি; ৪। উচ্চ চিৎকার; উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন; ৫। বাঁচে; ৬। তপ্ত চোখের জল; ৭। গঙ্গাস্রোতের মতো; ৮। গদাধর, মুকুন্দ ইত্যাদিরা শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর; ৯। এখানে হরিদাস, ইনি ব্রহ্মার অবতার বলে গৃহীত; ১০। জ্বলন্ত অগ্নির মতো তপ্ত যৌবনবতী স্ত্রী; কারণ রূপসী নারীতে পুরুষরা পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হয়; ১১। স্নেহ, ভালবাসা; ১২। তাকে না দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; ১৩। দিনরাত্রির পার্থক্য নেই অর্থাৎ সদা সর্বদাই সকলের চিত্ত শোকে, বিরহে আকুল; ১৪। পদকর্তা নিজেও শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন।

৪

চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল[১]
জিতল[২] গৌর-তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম[৩] সীম[৪] নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন[৫] ভাঙনি[৬] রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন[৭] কলিযুগ-কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন[৮] রে॥
বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর[৯]
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে[১০]॥
নিজ-রসে নাচত[১১] নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি[১২] মেলি[১৩]।

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল[১৪]
গোবিন্দদাস তহিঁ[১৫] পরশ না ভেলি ॥

১। গৌরাঙ্গের দেহলাবণ্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি গোবিন্দদাস বলছেন, গৌরাঙ্গের দেহলাবণ্য চাঁপা, শোনফুল (হলুদবর্ণ) ও সুবর্ণপর্বতকে পরাজিত করেছে। ২। জিত্‌লো গৌরদেহের লাবণ্য। ৩। গ্রীবা; ৪। সীমা; ৫। জগতের মনোমুগ্ধকারী; ৬। ভঙ্গী; ৭। অলঙ্কার; ৮। কলিযুগরূপ সাপের ভয়কে যিনি খণ্ডন করেন; ৯। সকল শরীর পুলকের শিহরণে আকুলিত; ১০। কত গঙ্গা নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে। ১১। নিজের প্রেমরসে মত্ত হয়ে আপনি নাচছেন; ১২। ভক্ত; ১৩। মিলিত হয়ে; ১৪। যে প্রেমরসে সমস্ত জগৎ ভেসে যায়; ১৫। পদকর্তা গোবিন্দদাস তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত রইলেন।

৫

নীরদ নয়নে[১] নীর ঘন সিঞ্চনে[২]
পুলক-মুকুল-অবলম্ব[৩]।
স্বেদ-মকরন্দ[৪] বিন্দু বিন্দু চুয়ত[৫]
বিকশিত ভাব-কদম্ব[৬] ॥
কি পেখলুঁ[৭] নটবর[৮] গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু[৯]
সুরধুনী-তীরে উজোর[১০] ॥
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু[১১]
ভকত-ভ্রমরগণ[১২] ভোর[১৩]।
পরিমলে লুবধ[১৪] সুরাসুর ধাবই[১৫]
অহনিশি রহত অগোর[১৬] ॥

অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে[১৭]
অখিল-মনোরথ পূর[১৮]।
তাকর[১৯] চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

১। মেঘের ন্যায় চক্ষু দু'টি; ২। অবিরত জলধারা বর্ষিত হচ্ছে সেই চোখ থেকে; ৩। পুলকরূপ মুকুলের অবলম্বন তরু গৌরাঙ্গ; ৪। মধুরূপ ঘাম; ৫। চুইয়ে চুইয়ে; ৬। সমূহ, ভাবসমূহ বিকশিত হচ্ছে (ভাব—দিব্যভাব;) ৭। কি দেখলাম!; ৮। নৃত্যরত; ৯। গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গ যেন সুবর্ণবৃক্ষ (কল্পতরু, কারণ তাঁর কাছে যে যা প্রার্থনা করছে, তিনি তাই পূরণ করছেন)। চলমান কল্পতরু (নৃত্যরত গৌরাঙ্গ), তাই অভিনব। ১০। উজ্জ্বল; ১১। চরণতলে ঝঙ্কার করছে। নৃত্যরত চঞ্চল চরণপদ্মের কাছে ভক্তরা গুনগুন্ ক'রে ঝঙ্কার তুলেছেন; ১২। ভক্তরূপ ভ্রমর; ১৩। বিভোর হ'য়ে; ১৪। সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে; ১৫। ধাবিত হচ্ছে; ১৬। অজ্ঞান। শ্রীচৈতন্যের পদতলে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। ১৭। অবিরত প্রেমরূপ রত্নফল বিতরণ করছেন; ১৮। সমস্ত পৃথিবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন; ১৯। তাঁর।

৬

হেদে রে নদীয়াবাসী[১] কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও[২] ॥
তো সবারে[৩] কে আর করিবে নিজ কোরে[৪]।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে[৫] ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলী[৬] নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥

আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ[৭]।
আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাশ[৮] ॥
কাঁদয়ে ভকত গণ[৯] বুক বিদারিয়া[১০]।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥[১১]

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর নদীয়াবাসীর শোকের চিত্র এখানে বর্ণিত হয়েছে। ১। নদীয়াবাসীকে সম্বোধন করে পদকর্তা বলছেন; ২। হাত বাড়িয়ে গোরাচাঁদকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। কার মুখের দিকে চেয়ে অর্থাৎ কার প্রত্যাশায় দিন কাটাবে?; ৩। তোমাদের সকলকে; ৪। কোলে; ৫। কাতর ব্যক্তিকে; ৬। সকলের নয়নের মণি; ৭। কাছে; ৮। কীর্তনগানের আনন্দ আর পাবে না, শ্রীচৈতন্যকে বাদ দিয়ে; ৯। ভক্তগণ। ১০। বিদীর্ণ করে; ১১। পদকর্তা আক্ষেপ করে বলছেন, তিনি এতো আঘাতেও মিলিয়ে যাননি, এতোই পাষাণ (নির্মম) তিনি।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

৭

আমার শপতি[১] লাগে না ধাইও ধেনুর আগে।
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ[২] মোহন বেনু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।

তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয়[৩] আছে ॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে[৪] বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি[৫] দেহ মোর মাথে ॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি[৬] যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই[৭] হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে[৮] রাঙ্গা পায় ॥

১। শপথ, দিব্যি (শপথ>শপতি); ২। বাজাইও>বাজিও; ৩। শক্রর ভয়; ৪। কারুর কথা শুনে বড় গরু চরাতে যেও না; ৫। মায়ের মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর বা দিব্যি কর। ৬। সূর্যকর বা রৌদ্র; ৭। পাদুকা বা জুতা (উপানৎ>পানই)।

৮

দধি-মন্থ-ধ্বনি[১] শুনইতে[২] নীলমণি
আওল[৩] সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ-বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে[৪]।

নবনী-লোভিত[৫] হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পূরি[৬] কর খাইতে রঙ্গিমাধর[৭]
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি[৮]।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড[৯] উথলিল[১০] মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী[১১] গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর ॥

১। দধিমন্থনকালে যে শব্দ উত্থিত হয়; ২। শুন্‌তে পেয়ে; ৩। এলো< আসিল; ৪। সম্মুখে; ৫। ননী-লুব্ধ; ৬। পূর্ণ করে; ৭। রাঙা অধর; ৮। ভাল, সুন্দর; ৯। দধিমন্থনের যে কাঠি (দণ্ড) তা কাজে লাগাতে ভুলে গেলেন অর্থাৎ বালগোপালের নৃত্য দেখে মাতা যশোমতী গৃহকর্ম ভুলে গেলেন; ১০। উথ্‌লে উঠলো; ১১। যশোমতীর সহচরী।

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে[১] গোপাল কান্দে অনুরাগে[২]
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা

না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা[৪] ॥
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে[৫]
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী রমণী হাসে[৬] দাঁড়াইয়া চারিপাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া ॥
অন্যের ছাওয়াল[৭] যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে ॥
বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।[৮]
পরের ছাওয়াল[৯] পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তোর ॥
অঙ্গদ-বলয়-তাড়[১০] আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা[১১] লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার ॥
বলরাম দাসে কয় এই কর্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।[১২]
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥

১। সম্মুখে; ২। এ কান্না দুঃখের নহে, অনুরাগের, অভিমানের

৩। অশ্রুধারা ; ৪। মা হ'য়ে তুমি আমাকে ননীচোর বলে' বদনাম দিচ্ছ, তোমার ঘরে আমি আর থাকবো না ; ৫। গরু দোহাবার সময়ে যে দড়ি দিয়ে গরুর পেছনের পা দু'টো বাঁধা হয়, তাকে বলে ছাঁদন-দড়ি ; ৬। গোপালের অভিমান দেখে গোয়ালিনীরা হাসছেন ; ৭। ছেলে ; ৮। ঠিকমতো অনুসন্ধান না করেই মা তার নামে দোষ দিচ্ছেন ননীচুরির, আসলে তো বলাই ননী খেয়েছে। এসব শিশুর অভিমানের কথা—বাৎসল্য রস অপূর্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে ; ৯। অভিমানে শিশুকৃষ্ণ বলে, আমি পরের ছেলে কিনা, তাই এইরকম আচরণ করছ আমার সঙ্গে। [শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত নন। বসুদেবের ঔরসে, দেবকীর গর্ভে তাঁর জন্ম। মাতুল কংসের ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণের জন্মরাত্রিতেই তাঁকে নন্দের আলয়ে রেখে আসেন। নন্দ ও তাঁর পত্নী যশোদা তাঁকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেন।] ; ১০। এক ধরনের বালা অলঙ্কার / বালা / তাগা ; ১১। খুলে নাও (অভিমানের তীব্রতা) ; ১২। কোলে তুলে নাও, কবি বলছেন।

১০

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো[১] সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে[২]
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো[৩] মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।

বিহি[৪] কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি[৫] বনে পাঠাইয়া দিব ॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা[৬] লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়[৭] ॥

মাতা যশোদা বালক গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাবার আগে নানা দুশ্চিন্তায় গোপালের সঙ্গী-সাথীদের ডেকে বলছেন…

১। তোমাদের সকলকে ; ২। গোপালকে মাঝখানে রেখে তোমরা বন্ধুরা আগে পেছনে থেকো ; ৩। গরুর পাল নিয়ে বেশি দূরে যেও না ; ৪। বিধাতা ; ৫। সেজন্য ; ৬। পাদুকা ; কবি বলছেন, আমরা গোপালের পায়ে তৃণাঙ্কুর ফুট্‌তে দেব না, তার পায়ে পাদুকা যোগাব ; ৭। তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলে গেলাম। কবি বলরামদাস এখানে গোপালের সাথী হিসেবে নিজেকে ভেবেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ

১১

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ[১] কে দিল ময়ুর-পুচ্ছ
ভালে[২] সে রমণী-মনোলোভা[৩]।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা[৪] ॥
মল্লিকা মালতী-মালে[৫] গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া[৬]।

হেন মনে অনুমানি[৭] বহিতেছে সুরধুনী
নীল গিরি-শিখর বাহিয়া[৮] ॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিলে ফাগু রঙ্গিয়া।[৯]
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া[১০] ॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়েছে[১১]
কালিন্দী পূজিল করবীরে[১২]।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যাম রূপ দেখি ধীরে ধীরে[১৩] ॥

১। খোঁপাটা মাথার ওপর কে বেঁধে দিল; ২। কপাল; ৩। নারীর ...নোহরণকারী; ৪। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পুচ্ছের বিস্তার দেখে মনে হয় যেন ...াকাশের নবমেঘে রামধনুর (ইন্দ্রধনু) শোভা প্রকাশ পাচ্ছে; ৫। বেলফুল-...ামেলীফুলের মালা; ৬। মাথার চূড়াটি বেষ্টন করে' কে ফুলের মালা গেঁথে ...দল কপাল ঘিরে; ৭। তাতে মনে হয়; ৮। গঙ্গা যেন বয়ে চলেছে ...ীলগিরি পর্বত থেকে; ৯। কৃষ্ণের কপালে চন্দনের ফোঁটা ঝিক্‌মিক্ করছে. ...নে হয় যেন চাঁদ, তার ওপর আবার ফাগের রঙ দিয়ে রাঙানো; ১০। রৌপ্য ...াধারে যেন কেউ যমুনা দেবীকে পূজা করেছে জবাফুল দিয়ে; ১১। কৃষ্ণের ...ালো অঙ্গে কে রক্তবর্ণ হিঙ্গুল গুলে যেন লাগিয়ে দিয়েছে; ১২। তাতে মনে ...য় যেন রক্তকরবীকে কালো যমুনা পূজা করছে; ১৩। শ্যামরূপের পরিপূর্ণ ...োভা যেন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। এ তো এক নজরে দেখে নেবার বস্তু ...য়। এই বিচিত্র শোভিত রূপ আস্তে আস্তে আস্বাদ করতে হবে। পদকর্তার ...নে এই ভাবই জেগেছে।

১২

মঞ্জু[১] বিকচ[২] কুসুম-পুঞ্জ
মধুপ-শব্দ গঞ্জি[৩] গুঞ্জ[৪]
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন[৫]
মঞ্জুল[৬] কুলনারী।
ঘন-গঞ্জন চিকুর-পুঞ্জ[৭]
মালতী-ফুল-মাল রঞ্জ[৮]
অঞ্জন-যুত[৯] কঞ্জ-নয়নী[১০]
খঞ্জন-গতি-হারী[১১] ॥
কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ[১২]
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ[১৩]
কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী ॥
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিয়দমন-দমন-রঙ্গ[১৪]
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥[১৫]
দশন কুন্দ-কুসুম নিন্দু[১৬]
বদন জিতল শারদ ইন্দু[১৭]
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥[১৮]
অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ

মন্দ মন্দ হসনানন্দ
নন্দন সুখকারী ॥
মণি-মানিক নখে বিরাজ[১৯]
কনক নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ[২০]
চরণকি বলিহারি ॥[২১]

১। সুন্দর; ২। বিকশিত; ৩। মৌমাছির গুঞ্জনকেও যে ধ্বনি ধিক্কার দেয়, এমনি শব্দ; ৪। গুঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ রাধার নূপুরের গুঞ্জনধ্বনি; ৫। গজগতিকেও যে গমন ধিক্কার দেয় অর্থাৎ রাধার গমন-সৌন্দর্য এতোই অনুপম যে গজেন্দ্র গতিকেও গঞ্জনা দেয়; ৬। সুন্দর; ৭। মেঘকেও গঞ্জনা করে, এমনি কালো কেশরাশি; ৮। চামেলীফুলের মালার দ্বারা শোভিত বা প্রীতিজনক; ৯। কাজলযুক্ত; ১০। পদ্মপলাশ নয়না; ১১। খঞ্জন-পক্ষীর গতিকেও হার মানিয়ে দেয়, এমনই চঞ্চল চক্ষু; ১২। স্বর্ণ লাবণ্য-মণ্ডিত যে সুন্দর দেহ; ১৩। যৌবন-দেহলতায় কামদেবের প্রকাশ যেন ভরে আছে অর্থাৎ যৌবনের শোভা কামনা উদ্রেককারী; ১৪। শ্রীরাধার ভুরু দুটি যেন নাচছে. কবি তাদের ভুজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কালীয়-নাগকে যিনি দমন করেছিলেন, সেই কৃষ্ণকেও দমন করতে পারে এমনই রঙ্গ-কৌশল প্রকাশ পেয়েছে, শ্রীরাধার ভুরুরূপ ভুজঙ্গের নৃত্যে। ১৫। শ্রীরাধার সঙ্গিনীরা সব রঙীন নীল শাড়ী রঙ্গ করে' পরিধান করেছে; ১৬। দাঁতের শোভা কুন্দকুসুমকেও যেন নিন্দা করছে, ১৭। শারদ চাঁদকেও পরাজিত করেছে এমনই মুখের শোভা; ১৮। প্রেমরূপ সিন্ধু অতিক্রম করতে শ্রীরাধার পথ-শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে; ১৯। মণি-মাণিক্য যেন নখের শোভায় বিরাজিত; ২০। স্থলপদ্ম; ২১। চরণপদ্ম স্থলেই শোভা পাচ্ছে, তাতেই পদকর্তা মুগ্ধ, চমৎকৃত।

প্রার্থনা

১৩

তাতল[১] সৈকত[২] বারিবিন্দু সম
স্থত-মিত-রমণী-সমাজে[৩]।
তোহে[৪] বিসরি[৫] মন তাহে সমর্পিলুঁ[৬]
অব[৭] মঝু[৮] হব কোন কাজে ॥
মাধব, হাম[৯] পরিণাম নিরাশা[১০]।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে[১১] তোহারি[১২] বিশোয়াসা[১৩] ॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ[১৪]
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে[১৫] রমণী- রসরঙ্গে মাতলুঁ[১৬]
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন[১৭] মরি মরি যাওত
ন তুয়া, আদি অবসানা[১৮]।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত[১৯]
সাগর লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা[২০]।
আদি-অনাদিক- নাথ[২১] কহায়সি
ভব-তারণ-ভার তোহারা[২২] ॥

১। উত্তপ্ত; ২। বালুময় তীর (নদী বা সমুদ্রের); ৩। পুত্র-মিত্র-নারীপরিবৃত সংসারে; ৪। তোমাকে; ৫। বিস্মৃত হয়ে, ভুলে গিয়ে; ৬। সমর্পণ করলাম; ৭। এখন; ৮। আমি; ৯। আমার; ১০। হতাশাপূর্ণ; ১১। অতএব; ১২। তোমারি; ১৩। বিশ্বাস; ১৪। ঘুমিয়ে কাটালাম; ১৫। শৃঙ্গার কর্মে; ১৬। নারীরা সঙ্গে শৃঙ্গাররসের আস্বাদে মেতেছিলাম ১৭। চতুর্মুখ ব্রহ্মা; (এক এক ব্রহ্মা যুগযুগব্যাপী পরমায়ু ধারণ করেন, ১৮। তোমার আদি-ও নেই, অবসান-ও নেই অর্থাৎ শুরু-ও নেই, শেষ-ও নেই; ১৯। প্রবেশ করে, প্রবিষ্ট হয়; ২০। অপর; ২১। তুমি আদি ও অনাদির নাথ ব'লে লোকে মনে করে; ২২। এখন পৃথিবীকে তারণ করবার ভার (ত্রাণ বা রক্ষা করার ভার) তোমার। (পাঠান্তর—ভব তারণভার)। [বিদ্যাপতি এই পদটিতে যেন আত্মসমীক্ষা করেছেন। যৌবনে তিনি ছিলেন লৌকিক শৃঙ্গাররস আস্বাদের কবি। পরবর্তী কালে ঐশ্বর্যভাবসম্বলিত কৃষ্ণভক্তির কবি।]

তুলনীয়—'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।'

১৪

মাধব[১] বহুত মিনতি করি তোয়[২]।

দেই তুলসী তিল[৩] দেহ সমর্পিলুঁ

দয়া জনু[৪] ছোড়বি মোয়[৫] ॥

গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি

যব তুহুঁ করবি বিচার[৬]।

তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি[৮]
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ[৯] ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে[১০] ইহ ভবসিন্ধু[১১]।
তুয়া[১২] পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক[১৩] দেহ দীনবন্ধু ॥

১। বিশ্বপিতা (ধব—স্বামী। বিশ্বমাতার স্বামী); ২। তোমাকে; ৩। তিলতুলসী দিয়ে কোনও জিনিস দান করলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কবি বলছেন, এ দেহের ওপর আমার তাই কোনও দাবি বা অধিকার নেই। ৪। যেন না; ৫। আমাকে; ৬। বিচার করতে বসলে দোষের সংখ্যা গুণ্তে গিয়ে গুণের লেশমাত্র পাবে না; ৭। তুমি জগতের নাথ; ৮। প্রচারিত; ৯। প্রসঙ্গে, তোমার প্রতি; ১০। পার হতে; ১১। এই সংসার সমুদ্র পার হতে; ১২। তোমার; ১৩। এককণা আশ্রয় তোমার পদপ্রান্তে—তুমি দীনের বন্ধু।

১৫

হরি হরি আর কবে এমন দশা[১] হব।

ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি[২] হব

দোঁহারে নূপুর পরাইব[৩] ॥

টানিয়া বান্ধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়া[৪]

নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীতাম্বর বাস[৫] অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে

বদনে তাম্বূল দিব আর ॥

দুই রূপ মনোহারী[৬] দেখিব নয়ন ভরি

নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।

রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী

দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া ॥

হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি

এই করি মনে অভিলাষ।

জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন[৭]

নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

১। অবস্থা; ২। নারী; ৩। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ঘটাবো (কবি সখিভাবে এখানে ভজনা করেছেন।); ৪। কুঁচফুলের দ্বারা মালা গেঁথে খোঁপার চারপাশ ঘিরে দেবো; ৫। বস্ত্র; ৬। রাধা এবং কৃষ্ণের রূপ। ৭। আমাকে এইটুকুই সম্পদ দাও।

পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ

১৬

অবনত আনন কএ[১] হম রহলিহু[২]
বারল[৩] লোচন-চোর।[৪]
পিয়া-মুখ-রুচি[৫] পিবএ[৬] ধাওল[৭]
জনি[৮] সে চাঁদ চকোর ॥
ততহুঁ সাঞো[৯] হঠে[১০] হটি[১১] মোঞে[১২] আনল
ধএল[১৩] চরণ রাখি।
মধুপ মাতল[১৪] উড়এ ন পারএ[১৫]
তইঅও পসারএ পাঁখি[১৬] ॥
মাধব বোলল মধুর বাণী[১৭]
সে শুনি মুহু মোঞে কান[১৮]।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাঁচবাণ[১৯] ॥
তনু-পসেবে[২০] পসাহনি[২১] ভাসলি[২২]
পুলক তৈসন[২৩] জাগু।
চুনি চুনি ভএ পঁচুঅ ফাটলি[২৪]
বাহু-বলয়া ভাগু[২৫] ॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো[২৬]
বোলল বোল না যায়[২৭]।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
শ্যামসুন্দর—কায়[২৮] ॥

১। করে; ২। রইলাম; ৩। বারণ করলাম; ৪। চোখরূপ চোরকে; ৫। প্রিয়তমের (কৃষ্ণ) মুখসৌন্দর্য; ৬। পান করবার জন্য; ৭। ধেয়ে গেলো; ৮। যেন; [আমি (রাধা) মুখ নিচু করে' রইলাম এবং আমার পিয়াসী চোখ দু'টিকে (লোচনরূপ চোর) বারণ করলাম অর্থাৎ মুখ নিচু করে' রাধার উদ্দেশ্যই যেন চোখ দু'টো ফাঁকি দিয়ে কৃষ্ণকে না দেখে নেয়। কিন্তু চকোর যেমন চাঁদের সুধাপান করবার জন্য ধেয়ে যায়, তেমনি আমার চোখ দু'টি কৃষ্ণের মুখসৌন্দর্য পান করবার জন্য ধেয়ে গেল।]; ৯। সেই স্থান থেকে; ১০। হঠকারী, একগুঁয়ে; ১১। হটিয়ে, ফিরিয়ে; ১২। আমাকে; ১৩। ধরে রাখলাম; ১৪। মত্ত ভ্রমর; ১৫। উড়তে পারে না; ১৬। তবুও পাখা বিস্তার করে (ওড়বার জন্য ছটফট্ করে); [সেই স্থান থেকে আমার একগুঁয়ে চোখ দু'টিকে জোর করে ফিরিয়ে এনে পায়ের দিকে ধরে রাখলাম অর্থাৎ চোখের নজর পায়ের দিকে নিবদ্ধ করলাম। মধু পান করে' মত্ত ভ্রমর যেমন উড়তে পারে না, তবুও পাখা ছটফট্ করে, তেমনি আমার (রাধার) রূপমুগ্ধ নয়ন তাকাবার (ওড়বার) শক্তি হারিয়ে পাখা ছটফট্ করতে ছাড়লো না অর্থাৎ দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারলো না।]; ১৭। মাধব মিষ্টি কথা বললেন; ১৮। তা শুনে আমি কান ঢাক্‌লাম; ১৯। কান ঢাকতে যেটুকু দেরি হয়েছে, সেই অবসরে সেইখান দিয়ে (শ্রবণ পথে) মদন পঞ্চবান ধনু ধরে' আমার প্রতি বিরূপ হলো অর্থাৎ আমাকে কাতর করে' তুল্‌লো; ২০। দেহের ঘামে; ২১। প্রসাধনী; ২২। ধুয়ে গেল; ২৩। তেমনি অধিক; ২৪। দেহ এতো বেশি পুলকিত হলো যে চুন্‌চুন্ শব্দ করে' কাঁচলি ফেটে গেলো অর্থাৎ ছিঁড়ে গেল; ২৫। বাহুর বলয় ভেঙে গেলো; ২৬। কর কম্পিত হয়; ২৭। কথা বলা যায় না অর্থাৎ আবেগে বাক্‌রোধ হচ্ছে; ২৮। দেহ (কৃষ্ণের মতো সুন্দর দেহ-ধারী রূপবান রাজা)।

১৭

আলো মুঞি[১] জানো না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া[২] নিলে ছলিয়া নাগর ছলে
রূপের পাথারে[৩] আঁখি ডুবি[৪] সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান[৫]।
অন্তরে বিদরে হিয়া[৬] কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা॥
কটি-পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।[৭]
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া[৮]॥
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা[৯] রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু-কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ়[১০] করি থাক[১১] বুক॥

পাঠান্তর—আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।

১। আমি; ২। হরণ ক'রে; ৩। রূপের সাগরে; ৪। ডুবে; যৌবনের স্বপ্নমধুর বনে প্রবেশ ক'রে আমার মন পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখান থেকে বের হবার পথ খুঁজে না পেয়ে ঘুরে মরছে। ৫। অফুরন্ত; ৬। হৃদয় ভেতরে ভেতরে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; ৭। কটিভূষণ তাতে জড়ানো; ৮। কুঁড়ি; কলঙ্কের কুঁড়ি; ৯। প্রচার (কলঙ্ক-প্রচার); ১০। দৃঢ়; ১১। বান্ধ (পাঠান্তর)।

১৮

এমন পিরীতি[১] কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে[২] দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল[৩] না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন[৪] যেন কবহুঁ[৫] না জীয়ে[৬]।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে[৭] ॥
ভানু-কমল[৮] বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥
চাতক-জলদ কহি[৯] সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে-মধুপ[১০] কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥
কি ছার চকোর-চান্দ[১১] দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥

১। প্রেম; ২। দু'জনে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে, কোলে (ক্রোড়)। অত্যন্ত নিকটে থেকেও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনুভব করে' উভয়েই দুঃখ পায়। এই মনোভাবের মধ্যেই পাই প্রেমবৈচিত্ত্যের পূর্বাভাস। ৩। আধমুহূর্ত; ৪। মাছ; ৫। কখনও বাঁচে না; ৬। জীবিত; ৭। শোনা যায় না; ৮। সূর্য এবং পদ্মফুল পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনায় সে প্রেম কিছু নয়। কেননা, শীতকালে পদ্মফুল মরে গেলেও সূর্য যথারীতি সুখে থাকে। একজনের সুখদুঃখের ভাগী যদি অন্যজন না হয়, সে প্রেমের সঙ্গে কি

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা চলে? ৯। চাতক এবং মেঘ ঠিক তেমনি পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু সে প্রেম-ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনায় তুচ্ছ। কারণ, বর্ষাকাল না এলে মেঘ তো চাতককে জল দেয় না। এ তো সাময়িক, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিত্যকার। ১০। ফুল এবং ভ্রমরের প্রেমের কথা শোনা যায়, কিন্তু তা-ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাছে তুচ্ছ, কারণ ভ্রমর ফুলের কাছে না এলে মধু পায় না। ফুল নিজে গিয়ে তো ভ্রমরকে মধু দান করে না! অর্থাৎ দু'পক্ষের সমান আগ্রহ নেই; কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দু'জনেই দু'জনের আকর্ষণে অতুলনীয়। ১১। চাঁদ ও চকোর সম্পর্কে পরস্পরের প্রেমের গভীরতা শোনা যায়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনায় তা তুচ্ছ।

১৯

কাহারে কহিব মনের মরম[১]
কেবা যাবে পরতীত[২]
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন-আগে[৩] দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে[৪]
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল[৫]
তাহে কি পরাণ রয়॥

কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিনু সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥

১। মনের ভেতরের কথা; ২। বিশ্বাস; ৩। গুরুজনের সম্মুখে; ৪। চারদিক তাকাতে গিয়ে; ৫। যমুনার কালো জল ঝলমল করলে মনকে বেঁধে রাখা যায় না।

২০

ঘরের বাহিরে দণ্ডে[১] শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়[২]।
মন উচাটন[৩] নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই কেন বা এমন হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেবা পাইল[৫]॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ[৬] নাহি করে।
বসি থাকি থাকি[৭] উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসীঞা[৮] পরে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে[৯] বাঢ়য়ে[১০] লালসে[১১]
না বুঝি তাহার ছলা॥[১২]

তাহার চরিতে[১৩] হেন বুঝি চিতে[১৪]
হাত বাড়াইল চাঁদে।[১৫]
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়[১৬]
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে[১৭] ॥

১। দাঁড়ায়; ২। খুব অল্পবারই যাতায়াত করে; ৩। উদ্বিগ্ন; ৪। দুর্জন; ৫। কোথাকার কোন্ অপদেবতা ভর করেছে, তাই গুরুজনকে ভয় করে না, দুর্জনদের নিন্দাবাদকেও পরোয়া করে না; ৬। বসনের আঁচল পর্যন্ত সামলায় না অর্থাৎ যুবতীর যৌবনলজ্জাও ভুলে গেছে; ৭। বসে থেকে থেকে হঠাৎ; ৮। খসে; ৯। আকাঙ্ক্ষা করে; ১০। বাড়ায়; ১১। লালসা অর্থাৎ কি প্রত্যাশা করে' রাধা তার লালসাকে বাড়িয়ে চলে? ১২। ছলনা; ১৩। আচরণ দেখে; ১৪। এমন মনে হয়; ১৫। সে যেন চাঁদ পাবার আশায় হাত বাড়িয়েছে অর্থাৎ অসম্ভবকে পাওয়ার প্রত্যাশা করেছে; ১৬। বিনয়সহকারে; ১৭। কালাচাঁদ অর্থাৎ কৃষ্ণের ফাঁদে মনকে ধরা দিয়েছে।

২১

ঢল ঢল কাঁচা[১] অঙ্গের লাবণি[২]
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে[৩]
মদন মূরুছা[৪] পায় ॥
কিবা সে নাগর[৫] কি খেণে দেখিলুঁ[৬]
ধৈরয রহল দূরে।[৭]
নিরবধি মোর[৮] চিত বেয়াকুল[৯]
কেন বা সদাই ঝুরে।[১০]

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে[১১] বিষম বিশিখে[১২]
পরাণ বিন্ধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর[১৩]
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে[১৪] ॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল[১৫]
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে[১৬]
দাস গোবিন্দ কয় ॥

১। টল্‌টলে যৌবন; ২। অঙ্গের লাবণ্য অর্থাৎ অঙ্গের লাবণ্য যেন পৃথিবীতে বয়ে চলেছে; যৌবনের উচ্ছলতায় পৃথিবী যেন ভেসে চলেছে; ৩। সামান্য হাসির (মুচ্‌কি হাসির) তরঙ্গ হিল্লোলে; ৪। মদন মূর্চ্ছা যায়; ৫। সেই নাগর কি অপরূপ!; ৬। কি ক্ষণেই না দেখেছিলাম; ৭। তাতে ধৈর্য হারিয়ে ফেল্‌লাম; ৮। সেই থেকে আমার; ৯। চিত্ত ব্যাকুল; ১০। কাঁদে; ১১। নয়ন-কটাক্ষে; ১২। দারুণ (তীক্ষ্ণ) শরে, ১৩। উন্মত্ত ভ্রমর; ১৪। ঘুরে ঘুরে গুঞ্জন করে; ১৫। মর্মে বেঁধেছে; ১৬। শেষে কি যে হবে জানি না।

২২

বেলি অবসান-কালে[১] একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যাম রায়[২] ।

ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায় ॥

যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে[৩]
বিম্বের মাঝারে শ্যাম রায় ।

চূড়ার টালনি বামে[৪] ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে[৫]
হেরিয়া সে কুল রাখা দায়[৬] ॥

পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ
জল স্থির হইলে দেখি কানু[৭] ।

ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু ॥

কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে ।

হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম-গুণমণি
সেই দুখে হৃদয় বিদরে[৮] ॥

বসু রামানন্দের[৯] বাণী শুন শুন বিনোদিনী
অকারণে জলে ডুবেছিলে ।

বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ-ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে ॥

১। বেলাশেষে; ২। যমুনার জলে কৃষ্ণের ছায়া দেখে মুগ্ধা রাধা ভাবছেন যে, কানু বুঝি জলের ভেতরেই লুকিয়ে আছেন; ৩। হঠাৎ প্রতিবিম্ব (reflection) ওঠে; ৪। বাঁদিকে হেলে আছে চূড়াটি; ৫। তিন অংশে বাঁকা হ'য়ে সেই কায়দায় যে দাঁড়ায় (যে মাথা, কোমর, পা হেলিয়ে দাঁড়ায়); ৬। এই রূপ দেখে রাধা ভাবছেন, তাঁর কুলমর্যাদা রক্ষা করাই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, এমনই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ; ৭। জলে ঢেউ দেখা দিলে প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হ'য়ে যায়, আবার জল স্থির হ'লে প্রতিবিম্ব দেখা যায়; ৮। হৃদয় বিদীর্ণ হয়; ৯। কেউ কেউ একে চণ্ডীদাসের পদ বলে মনে করেন।

২৩

রূপে ভরল দিঠি[১] সোঙরি[২] পরশ মিঠি[৩]
পুলক না তেজই অঙ্গ[৪]।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত[৫]
না শুনে আন পরসঙ্গ[৬] ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ[৭]।
কানু-অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ[৮] ॥
নাসিকাহো[৯] সে অঙ্গের সৌরভে উনমত[১০]
বদনে না লয় আন[১১] নাম।
নব নব গুণগণে[১২] বান্ধল মঝু মনে[১৩]
ধরম রহব কোন ঠাম[১৪] ॥

গৃহপতি-তরজনে[১৫] গুরুজন-গরজনে[১৬]
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহি এক মনোরথ[১৭] যদি হয় অনুরত[১৮]
পুছত[১৯] গোবিন্দদাস॥

১। দৃষ্টি; কৃষ্ণের রূপের দ্বারা আমার নয়ন ভরে উঠ্‌লো। ২। স্মরণ করে; ৩। মিষ্টি স্পর্শ; ৪। আমার (রাধা) অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছে (পুলক ত্যাগ করছে না); ৫। শ্রবণ পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে; ৬। অন্য প্রসঙ্গ শুনতে চায় না (আমার কান); ৭। উপদেশ দিয়ে কি করবি; ৮। কণামাত্র (ধর্মের কথা কণামাত্র শোনে না। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'); ৯। নাকও; ১০। উন্মত্ত; ১১। অন্য; ১২। নতুন নতুন গুণরাশি; ১৩। আমার মনকে বেঁধে ফেলছে; ১৪। সেখানে ধর্মের স্থান কোথায়? ১৫। তর্জন; ১৬। গর্জন (স্বামী, গুরুজন ইত্যাদির তর্জন-গর্জনে মনে মনে হাসি উদ্রেক করে); ১৭। তাই একমাত্র কামনা; ১৮। অনুরক্ত; ১৯। জিজ্ঞাসা করছেন।

২৪

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে[১] গুণে মন ভোর[২]।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি[৩] লাগি থির[৪] নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি[৫] নাহি টুটে[৬]।
বল কি বলিতে পারি যত মন উঠে॥

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে[৭] গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার[৮]।
লহু লহু হাসে পহুঁ[৯] পিরীতির সার ॥
গুরু-গরবিত[১০] মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে[১১] ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার[১২]।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার[১৩] ॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে[১৪] ভেজাই আগুনি ॥

১। চোখের জল পড়ে; ২। ভরে আছে, পূর্ণ; ৩। প্রেম; ৪। স্থির; ৫। ব্যগ্রতা, আকাঙ্ক্ষা; ৬। ভেঙে যায় না; ৭। আকুলিত হচ্ছে; ৮। মধুর ধারা; ৯। প্রভু; ১০। গুরুজন ও পূজনীয়দের সঙ্গে; ১১। প্রসঙ্গ; ১২। প্রকার; নানা কাণ্ড ক'রে এই পুলক গোপন করতে চেষ্টা করি; ১৩। অবিরল; ১৪। লজ্জা ও গৃহে অগ্নি (আগুনি) জ্বালিয়ে (ভেজাই) দি'। অর্থাৎ গৃহ ও লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে এই প্রেম।

২৫

যাঁহা যাঁহা[১] নিকসয়ে[২] তনু তনু জ্যোতি[৩]।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি[৪] চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই[৫]।
তাঁহা তাঁহা[৬] থল-কমল দল খলই[৭] ॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি[৮] ॥

যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর[৯] ভাঙ বিলোল[১০]।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল[১১] ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন[১২] পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল[১৩] বন ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম[১৪] হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ[১৫] ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল[১৬] কান[১৭]।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান[১৮] ॥

এটি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ।

১। যেখানে যেখানে ; ২। নিঃসৃত হয়, স্ফুরিত হয় ; ৩। ক্ষীণদেহের লাবণ্যজ্যোতি ; ৪। বিদ্যুৎ ; ৫। সেখানে সেখানে ; ৬। চঞ্চলভাবে চলে যায় ; ৭। স্থলপদ্মের দল (পাপড়ি) যেন স্খলিত হয় ; ৮। হে সখি ! দেখতো, এ কোন্ নারী যে সহচরীদের সঙ্গে মিলে আমার জীবন নিয়ে খেলা করছে ; ৯। বঙ্কিম ; ১০। বাঁকা চঞ্চল কটাক্ষ (ভাঙ—ভ্রূ) ; ১১। গঙ্গার তরঙ্গ উথলে ওঠে ; ১২। দৃষ্টি, নজর পড়ে ; ১৩। নীল পদ্ম ; ১৪। মধুরময় ; ১৫। কুন্দ ও কুমুদ ফুল প্রকাশ পায় ; ১৬। মুগ্ধ হলো ; ১৭। কানু ; ১৮। রাধাকে চিনেও যেন চিনতে পারছেন না।

২৬

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে[১]
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে[২] চাহে মেঘ পানে[৩]
না চলে নয়ান-তারা[৪]।

বিরতি আহারে[৫] রাঙ্গাবাস পরে[৬]
যেমত যোগিনী পারা[৭] ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি[৮] ।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
একদিঠ[৯] করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে[১০] ।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়[১১]
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

১। একলা একলা থাকে ; ২। ধ্যানস্থ, তন্ময় ; ৩। মেঘের বর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের সাদৃশ্যহেতু ; ৪। নয়নতারা স্থির হয়ে থাকে ; ৫। খাবারের প্রতি আগ্রহ নেই ; ৬। গেরুয়াবসন পরিধান করে ; ৭। যোগিনীর মতো ; ৮। চুল খুলে বারবার দেখে (কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ সাদৃশ্যহেতু) ; ৯। একদৃষ্টে ; ১০। ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের রঙ লক্ষ্য করে (কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ সাদৃশ্যহেতু) ; ১১। নবপ্রণয়।

২৭

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে[১] পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে[২] যার এছন[৩] করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম[৪] কৈছে[৫] রয় ॥
পাসরিতে[৬] করি মনে পাসরা[৭] না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে[৮]
আপনার যৌবন যাচায়[৯] ॥

১। মর্মে ; ২। নামের প্রতাপে ; ৩। এরূপ ; ৪। সতীত্ব ; ৫। কেমন করে ; ৬। ভুলতে ; ৭। ভোলা ; ৮। নিজ সতীত্ব বিলিয়ে দিয়ে ; ৯। দান করে।

[নাম-জপের যে মাধুর্য তা ভগবৎ-প্রেমের ঐকান্তিকতায় সম্ভব। এখানে তারই প্রকাশ।]

২৮

সখি কি পুছসি[১] অনুভব মোয়[২]।
সোই[৩] পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে[৪]
তিলে তিলে নূতন হোয়[৫] ॥
জনম অবধি হাম[৬] রূপ নেহারলুঁ[৭]
নয়ন না তিরপিত[৮] ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি[৯] শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ[১০] না গেল ॥

কত মধু যামিনী রভসে[১১] গোঁয়াইলুঁ[১২]
না বুঝলুঁ কৈছন কেল[১৩]।
লাখ লাখ যুগ[১৪] হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ[১৫]
তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥
কত বিদগধ[১৬] জন রসে অনুমগন[১৭]
অনুভব কাহু না পেখ[১৮]।
কহ কবিবল্লভ[১৯] প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক ॥

[পদটি ভাবে ও বর্ণনায় অপূর্ব।]

১। জিজ্ঞাসা করছো; ২। আমার অনুভূতি; ৩। সেই; ৪। বর্ণনা করতে, ব্যাখ্যা করতে। ৫। হ'য়ে ওঠে। প্রেম সচল, জীবন্ত। প্রতি মুহূর্ত-ই নতুনভাবে উপলব্ধ হয়, তাকে নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ৬। আমি; ৭। দেখ্‌লাম; ৮। তৃপ্ত; ৯। কানে; ১০। শুনেও যেন তার স্পর্শ পেলাম না অর্থাৎ শুনেও যেন শুন্‌তে পেলাম না, আবার শুন্‌তে বাসনা হলো; ১১। ক্রীড়াকৌতুকে, সম্ভোগে; ১২। কাটালাম; ১৩। রতিক্রিয়া কিরূপ তা বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না; ১৪। যুগযুগ ধরে; ১৫ রাখ্‌লাম; ১৬। বিদগ্ধ, রসজ্ঞ; ১৭। পাঠান্তর—অনুমোদই; ১৮। কারুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করলাম না অর্থাৎ এমন রসজ্ঞ ব্যক্তি কাউকে দেখ্‌লাম না, যে এর মর্ম বোঝে; ১৯। কারুব মতে পদকর্তা বিদ্যাপতি।

২৯

হাথক[১] দরপণ[২] মাথক[৩] ফুল।
নয়নক[৪] অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ[৫] গীমক[৬] হার।
দেহক সরবস[৭] গেহক[৮] সার ॥

পাখীক পাখ[৯] মীনক[১০] পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব[১১] কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ[১২] দোহাঁ হোয়॥

১। হাতের; ২। দর্পণ, আয়না; ৩। মাথার; ৪। নয়নের; ৫। কস্তুরী-লেপন; ৬। গ্রীবার; ৭। সর্বস্ব; ৮। গৃহের; ৯। পাখা; ১০। মাছের; ১১। হে মাধব! তুমি কেমন? ১২। দু'জনে।

ভূমিকা—আগেকার দিনে হিন্দু মেয়েদের কাছে সব সময় আয়না থাকতো। এটা তাদের কাছে খুবই প্রিয় জিনিস ছিল। এখনও মন্দিরগাত্রে, পাথরে খোদাই করা নারীমূর্তি দেখা যায় যাদের হাতে আয়না আছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমার কাছে হাতের দর্পণের মতো অতি প্রিয়, মাথার ফুল, নয়নের কাজল, মুখের পান, বক্ষের কস্তুরী-লেপন (আগেকার দিনে সুন্দরীরা এভাবেই প্রসাধন করতো), গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পাখ্না, মাছের কাছে জল, জীবের জীবন; অর্থাৎ এসব যেমন একের কাছে অন্যে অপরিহার্য, নিত্য ব্যবহার্য, শ্রীকৃষ্ণ তুমি-ও আমার কাছে তেমনি অপরিহার্য। কিন্তু এতো ভালবেসেও তুমি যে কে তা বুঝে উঠ্তে পারলাম না। ভক্ত যেমন ভগবানকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, একাত্ম হয়েও তাঁর বিরাট রহস্যকে ভেদ করতে না পেরে ভাবে, তিনি কে? তিনি তো আমার সর্বস্ব। হে মাধব! তুমি ব'লে দাও, তুমি কে? তুমি কেমন? বিদ্যাপতি বলছেন, তোমরা দু'জনে পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ ভক্তের প্রেম-ও যেমন অসীম, ভগবানের রহস্য তেমনি অপার। তাই চিরন্তন লীলা চলেছে এই রহস্যভেদের।

অভিসার

৩০

আদরে আগুসরি[১] রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি[২]।

নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই[৩]
হেরইতে চির থির আঁখি[৪] ॥
পিরীতি-মূরতি অধিদেবা[৫]।
যাকর দরশনে[৬] সব দুখ মিটল
সোই আপনে করু সেবা[৭] ॥
হিমকর-শীতল নীরহি[৮] তিতল
করতলে মাজই মুখ[৯]।
সজল নলিনী-দলে[১০] মৃদু মৃদু বীজই[১১]
পুছই পন্থকি দুখ[১২] ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি অধরে তাম্বূল পুরি
মধুর সম্ভাষই কান[১৩]।
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া-সিনান[১৪] ॥

১। অগ্রসর হ'য়ে এসে ; ২। কোলের ওপরে পুনরায় স্থাপন করে ; ৩। চরণ দু'টি মুছিয়ে দিচ্ছেন ; ৪। স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে (পায়ের দিকে) তাকিয়ে রইলেন ; ৫। প্রেমের যিনি মূর্তিমান দেবতা ; ৬। যার দর্শনে ; ৭। তিনি নিজেই চরণ সেবা করছেন ; ৮। চন্দ্রের কিরণে যে জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ; ৯। আর্দ্র (তিতল) করতলের দ্বারা মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন ; ১০। পদ্মপাতার দ্বারা ; ১১। মৃদু মৃদু বাতাস করছেন ; ১২। রাস্তায় আসতে যে দুঃখকষ্ট পেয়েছেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন ; ১৩। কৃষ্ণ মিষ্টভাবে রাধাকে সম্ভাষণ করছেন ; ১৪। রাধার অমৃতস্নান হচ্ছে নিত্যনতুনভাবে (কৃষ্ণ প্রেমসাগরে)।

৩১

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আরতি[১] দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে[২]॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগৎ সুখী॥[৩]

এই পদটি অভিসারের হ'লেও মূলত রসোদ্গারের পদ অর্থাৎ রাধা সখিদের কাছে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী (ক.বি.) গ্রন্থের টীকায় আছে—"এই পদের ইঙ্গিত এইরূপ—ভগবান আমাদিগকে

কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্ত চিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।" রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় এই পদটির ব্যাখ্যা করেছিলেন।

১। প্রকাশ দেখে; ২। ঘরে আগুন লাগিয়ে দি; ৩। জগতের লোক এই রকম প্রেমকাহিনী শুনে সুখী হয়।

৩২

কণ্টক গাড়ি[১] কমল-সম পদতল
মঞ্জীর[২] চীরহি[৩] ঝাঁপি।
গাগরি-বারি[৪] ঢারি[৫] করি পীছল[৬]
চলতহি অঙ্গুলি চাপি[৭] ॥
মাধব তুয়া অভিসারক[৮] লাগি।
দুতর পন্থ[৯]- গমন ধনি সাধয়ে[১০]
মন্দিরে[১১] যামিনী জাগি ॥
কর-যুগে নয়ন মূদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে[১২]।
কর-কঙ্কণ-পণ[১৩] ফণিমুখ-বন্ধন[১৪]
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে[১৫] ॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই[১৬]
আন[১৭] শুনই কহ আন।

পরিজন বচনে মুগধী[১৮] সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ[১৯] ॥

১। পুঁতে; ২। নূপুর; ৩। বস্ত্র দিয়ে। পদ্মের মত সুন্দর পায়ের নূপুর বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করে—নূপুরের শব্দকে বাঁচাতে। প্রিয়তমের বংশীধ্বনি শ্রবণে যখন যাত্রা করতে হবে, তখন হয়তো কণ্টকময় পথে চলতে হবে। তাই শ্রীমতী অঙ্গনে কাঁটা পুঁতে কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছেন। ৪। জল (কলসীর জল); ৫। ঢেলে; ৬। পিচ্ছিল; ৭। পিচ্ছিল পথে আঙুল চেপে চেপে হাঁটা অভ্যাস করছেন শ্রীমতী। যদি বর্ষাভিসারে যেতে হয়। ৮। মাধবের কাছে অভিসারের জন্য; ৯। দুস্তর পথ; ১০। অভ্যাস করছে; ১১। গৃহে; রাত্রে গৃহে জেগে থেকে শ্রীমতী প্রিয়মিলনের জন্য এই অভ্যাসগুলি করছেন; ১২। অন্ধকারে যাওয়া-আসা করা শেখবার জন্য চোখে আঙুল চাপা দিয়ে শ্রীমতী অভ্যাস করছেন; ১৩। হাতের কঙ্কণ পণ দিয়ে অর্থাৎ পুরস্কারস্বরূপ দান করে। ১৪। সাপের মুখ কিভাবে বন্ধ করতে হয়, তার কৌশল। যাতে সাপ কামড়াতে না পারে। ১৫। সাপের গুরু অর্থাৎ সাপুড়ে বা ওঝার কাছে শ্রীমতী সেই শিক্ষা নিচ্ছেন। ১৬। কালার মত শুন্‌তে পাচ্ছেন না; ১৭। অন্য। কালা লোকের মতো গুরুজনদের এক কথা শুনে, অন্য কথার উত্তর দিচ্ছেন; ১৮। নির্বোধ; মুগ্ধ>মুগধী; ১৯। সাক্ষী; প্রমাণ>পরমাণ; গুরুজনদের কথা শুনে বোকার মতো হাস্‌ছেন শ্রীমতী।

৩৩

কুল মরিয়াদ[১]- কপাট উদঘাটলুঁ[২]
তাহে কি কাঠকি বাধা।[৩]
নিজ মরিয়াদ[৪]- সিন্ধুসঞে পঙারলুঁ[৫]
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥[৬]
সজনি মঝু পরিখন[৭] কর দূর।

কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি[৮]
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর[৯] ॥
কোটি কুসুম শর[১০] বরিখয়ে যছুপর[১১]
তাহে কি জলদজল লাগি[১২] ।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি[১৩] ॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোপল[১৪]
তাহে তনু অনুরোধ[১৫] ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ[১৬] ॥

১। মর্যাদা (কুলমর্যাদা); ২। কুলমর্যাদারূপ দরজা উদ্ঘাটন করে' এগিয়ে এলাম; ৩। কাঠের দরজা আমার অভিসারে বাধা দেবে? ৪। আত্মমর্যাদা: ৫। আত্মমর্যাদারূপ সমুদ্র গোষ্পদের (গুবরলু) ন্যায় অবহেলে পার হলাম; ৬। সেখানে নদীর জল কি অগাধ হ'তে পারে? ৭। আমাকে পরীক্ষা (কোরো না); ৮। হরি পথের দিকে তাকিয়ে আছেন ব্যাকুল হৃদয়ে (আমার জন্য); ৯। তা স্মরণ করতে করতে আমার মন কেঁদে উঠ্‌ছে; ১০। মদনের কোটি পুষ্পবাণ; ১১। যার ওপর বর্ষিত হচ্ছে; ১২। বৃষ্টির জল কি তার গায়ে লাগে? ১৩। প্রেমের দহনে দগ্ধ যে হৃদয় সহ্য করে আছে, সেখানে বজ্রের আগুন কি করতে পারে? ১৪। যাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছি; ১৫। সেখানে দেহের মায়া কি করবে? (সখিরা বলেছিলো—'প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ'—রাধা তারই উত্তরে বলেন এই কথা)। ১৬। বুঝ্‌তে পারলো।

৩৪

গগনে অব ঘন মেহ[১] দারুণ
সঘনে দামিনী[২] চমকই (ঝলকই)।
কুলিশ-পাতন[৩] শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই[৪] ॥
সজনি, আজু দুরদিন[৫] ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি[৬]
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সঙরি[৭] মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাপ[৮] ॥
তুরিতে[৯] চল অব কিয়ে বিচারহ[১০]
জীবন মঝু আগুসার[১১]।
রায় শেখর- বচনে অভিসর[১২]
কিয়ে সে বিঘিনি[১৩] বিথার[১৪] ॥

১। ঘন মেঘ; ২। বিদ্যুৎ; ৩। বজ্র-পতন; ৪। বেগে প্রবাহিত হচ্ছে; ৫। দুর্দিন; ৬। অগ্রসর হয়ে, এগিয়ে; ৭। স্মরণ করে; ৮। গুরুজন-

দের দারুণ (সতর্ক) দৃষ্টি এখন দুর্যোগের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন ; ৯। ত্বরিতে, তাড়াতাড়ি ; ১০। বিচার-বিবেচনা করবার কি আছে ; ১১। আমার মন অগ্রসর হয়ে চলে গেছে সঙ্কেত কুঞ্জে, দেহটাকে নিয়ে যেতে এতো ভাবনা কিসের। ১২। পদকর্তার পরামর্শে, হে রাধে! তুমি অভিসারে বেরিয়ে পড় ; ১৩। বিঘ্ন ; ১৪। বিস্তৃত। এই বিস্তৃত বাধা এমন কিছু জোরালো নয়—পদকর্তা রাধাকে উৎসাহ দিচ্ছেন।

৩৫

মন্দির[১] বাহির কঠিন কপাট[২]।
চলইতে[৩] শঙ্কিল[৪] পঙ্কিল বাট[৫] ॥
তহিঁ[৬] অতি দূরতর[৭] বাদর দোল[৮]।
বারি[৯] কি বারই[১০] নীল নিচোল[১১] ॥
সুন্দরি কৈছে[১২] করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার[১৩] ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত[১৪]।
শুনইতে[১৫] শ্রবণে মরম জরি যাত[১৬] ॥
দশ দিশ দামিনী[১৭] দহন[১৮] বিথার[১৯]।
হেরইতে[২০] উচকই[২১] লোচন-তার[২২] ॥
ইথে[২৩] যদি সুন্দরি তেজবি গেহ[২৪]।
প্রেমক লাগি উপেখবি[২৫] দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার[২৬]।
ছুটল বাণ[২৭] কিয়ে যতনে নিবার ॥[২৮]

অভিসারের পথে কতো-ই না বাধাবিপত্তি। শ্রীরাধা একে একে সেই সব বাধার কথাই বর্ণনা করছেন।

১। গৃহ; ২। কঠিন দরজা (প্রথম বাধা); ৩। চলবার কালে; ৪। বিপজ্জনক; ৫। পাঁকযুক্ত পথ অর্থাৎ কর্দমময় পথ (দ্বিতীয় বাধা); ৬। তার ওপর; ৭। বহুদূর বিস্তৃত; ৮। বাদল (বৃষ্টি) ঝেঁপে এসেছে, যেন বর্ষা দোল খাচ্ছে; ৯। এই বৃষ্টি; ১০। নিবারণ করতে পারে? ১১। নীল শাড়ী (নীল শাড়ী কি এই বৃষ্টি আট্‌কাতে পারে?); ১২। কি-ভাবে; ১৩। শ্রীহরি যে মানস-গঙ্গার অপর পারে আছেন। "বৃন্দাবনে মানসগঙ্গা নামে একটি হ্রদ আছে।"); ১৪। বজ্রপাত হচ্ছে; ১৫। শুন্‌লে; ১৬। মর্ম জ্বলে যায়; ১৭। বিদ্যুৎ; ১৮। জ্বালা; ১৯। বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া; ২০। দেখ্‌লে; ২১। চম্‌কে ওঠে; ২২। চোখের তারা; ২৩। এতে; ২৪। গৃহত্যাগ করতে চাও; ২৫। উপেক্ষা করবি অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে; ২৬। এখন আর বাছবিচার চলে না; ২৭। যে বাণ ছুটে চলেছে অর্থাৎ একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে; ছুটন্ত তীর; ২৮। চেষ্টা করেও কি নিবারণ করা যায়? অর্থাৎ তাকে থামানো যায়?

৩৬

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক[১]।
পথ-আগমন-কথা[২] কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ[৩]॥
মন্দির[৪] তেজি[৫] যব পদ চার আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল[৬] ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী[৭]
ঘোর গহন অতি দূর।

আর তাহে জলধর বরিখয়ে[৮] ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর[৯] ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু[১০] নাহি জানলুঁ
চিরতুখ অব দূরে গেল ॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল[১১]
ছোড়লুঁ[১২] গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক তুখ তৃণ- হুঁ[১৩] করি না গণলুঁ[১৪]
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

১। দৈবদুর্দশা; ২। পথ দিয়ে যাত্রার কথা (অভিসারে); ৩। লাখ লাখ মুখ দিয়েও পথভ্রমণের দুঃখের কথা বলে শেষ করা যাবে না; ৪। গৃহ; ৫। ছেড়ে; ৬। ঘিরে ধরলো; ৭। অমারজনী, অমাবস্যা রাত্রি; ৮। বর্ষণ করছে; ৯। জর্জরিত; ১০। কিছুই গ্রাহ্য করলাম না (জানলাম না); ১১। প্রবেশ করলো; ১২। ছাড়লাম; ১৩। তৃণবৎ (তুচ্ছ) মনে হলো পথের কষ্ট; ১৪। গণনা করলাম।

৩৭

মেঘ-যামিনী[১] অতি ঘন আন্ধিয়ার[২]।
ঐছে সময়ে[৩] ধনি[৪] করু[৫] অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী[৬] দশ দিশ আপি[৭]।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি[৮] ॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল[৯]।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল ॥

বরিখত[১০] ঝরঝর খরতর মেহ[১১]।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ[১২] ॥
না হেরিয়া নাহ[১৩] নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা[১৪] নাগররাজ ॥[১৫]

১। মেঘাবৃত রাত্রি; ২। অন্ধকার; ৩। এমন সময়ে; ৪। সুন্দরী (শ্রীরাধা); ৫। করে; ৬। বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে; ৭। ব্যাপ্ত করে; ৮। আবৃত করে; ৯। সঙ্গিনী করে নিল; ১০। বর্ষণ হয়; ১১। তীক্ষ্ণ মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি-বজ্রগর্ভ মেঘ; ১২। সঙ্কেত কুঞ্জ; ১৩। নাথকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে; ১৪। যেখানে; ১৫। শ্রীকৃষ্ণ।

বংশীশিক্ষা

৩৮

আজু[১] কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল[২]।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দ-সুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কথি[৩] ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল ।
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী[৪] ॥

হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখাগণ করে ঠারাঠারি[৫] ॥

কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী[৬]।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥

আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত[৭] ॥

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে[৮] ॥

[ভূমিকা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কাছে বাঁশী শিখ্‌তে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, তুমি আমার মতো বেশভূষা পরিধান কর, আমার মতো ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াও, তবে তো আমার বাঁশী বাজ্‌বে। শ্রীরাধা অগত্যা তাই করলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া পরলেন। সখীরা দূর-বনে পুষ্পচয়নে যাওয়াতে ফেরার পথে তাঁরা শ্রীরাধার বাঁশীর স্বর শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন, আজ কে বাঁশী বাজাচ্ছেন? ইনি তো শ্যামরায় নন। এঁর গৌরবর্ণে বন আলোকিত হয়ে উঠেছে।—ইত্যাদি।]

১। আজ; ২। আলোকিত; ৩। কোথায়? নর্তকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের বেশ কোথা থেকে পেল? ৪। কৃষ্ণবর্ণা এক নারী দেখি তাঁর বামদিকে রয়েছেন। ইনি-বা কে? ৫। ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলে (ঠারেঠোরে কথা বলে)। ৬। রাধা। সখীরা যাবার সময়ে দেখে গেছেন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ছিলেন। এখন তাঁরা গেলেন-ই বা কোথায়? ৭। দু'জনের মনের ভাব-ই বোধ করি এরকমই। শ্রীকৃষ্ণ রাধার মনোভাব (চরিত্র) বোঝা ভার। বোধ করি, এটা তাঁদের লীলাখেলা। ৮। অনেকে মনে করেন, শ্রীরাধারূপে শ্রীচৈতন্যের যে সাধনা,

এ যেন তারই পূর্বাভাস। চৈতন্যদেব গৌরবর্ণ ও রাধা সেজে কৃষ্ণের জন্য নটবর বেশে নৃত্য করেছেন।

প্রেম-বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

৩৯

কি মোহিনী[১] জান বঁধু[২] কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥[৩]
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
কোন্ বিধি সিরজিল[৪] সোতের শেঁওলি[৫]।
এমন ব্যথিত[৬] নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী[৭]-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

১। যাদু; ২। প্রিয়তম; ৩। তোমাকে পাবার জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত সংস্কার এমনকি প্রকৃতির বিধানকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছি। তবু তোমার প্রেমের মহিমা বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না; ৪। সৃষ্টি করলো; ৫। স্রোতের শ্যাওলা; স্রোতের তীব্র টানে শ্যাওলা যেমন ভেসে চলে, তার নিজস্ব কোনও জোর থাকে না, ঠিক তেমনি তোমার প্রেমের তীব্র স্রোতের বেগে আমিও ভেসে চলেছি। ৬। সহানুভূতিশীল; ৭। কবি চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী।

৪০

যত নিবারিয়ে[১] চাই[২] নিবার না যায় রে।
আন[৩] পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা[৪] মোর হইল কি বাম[৫] রে।
যার নাম নাহি লই[৬] লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ[৭] শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব[৮]॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভালভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ[৯]॥

১। নিবারণ; যত চেষ্টা করি তাঁর কথা চিন্তা না করার, ততই যেন তা আরও বেশী করে' চিন্তা করায়; ২। পাঠান্তর—পায়; তায়। ৩। অন্য পথে অর্থাৎ অন্য কথা বলতে চেষ্টা করি; ৪। জিহ্বা, বাক্‌শক্তি; ৫। বিরূপ, আমার আয়ত্তের অতীত; ৬। যার নাম করবো না মনে করি; ৭। প্রসঙ্গ; কানুর কথা শুনবো না ভাবি, কিন্তু বারবার সেই কথায় কান চলে যায়; ৮। আমার ইন্দ্রিয় আমায় বশীভূত নয়, সে সর্বদা কানু-র কথাই শোনে, অনুভব করে। ৯। কবি বলছেন, রাধা! তুমি সুখেই আছ, প্রেমের গোপন কথা কারুর কাছে বলতে নেই।

৪১

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে[১] সিনান[২] করিতে
সকলি গরল ভেল[৩] ॥
সখি কি মোর করমে লেখি[৪]।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ[৫] দেখি ॥
উচল[৬] বলিয়া অচলে[৭] চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী[৮] চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল[৯]
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে ॥
পিয়াস[১০] লাগিয়া জলদ[১১] সেবিনু
বজর[১২] পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল[১৩] ॥

১। অমৃতসাগরে; ২। স্নান; ৩। হলো; ৪। লেখা; ৫। সূর্যকিরণ; ৬। উঁচু; ৭। পর্বত; ৮। লক্ষ্মী, শ্রী; ৯। ঘিরে ধরলো; ১০। তৃষ্ণা;

১১। মেঘ (বৃষ্টি); ১২। বজ্র ; ১৩। বজ্র ; কারুর মতে পদটি চণ্ডীদাসের লেখা।

মান ও কলহান্তরিতা

৪২

আন্ধল প্রেম[১] পহিল নহি জানলুঁ[২]
সো বহুবল্লভ কান[৩]।
আদর-সাধে[৪] বাদ করি তা সঞে[৫]
অহনিশি জ্বলত পরাণ[৬] ॥
সজনি, তোহে কহুঁ মরমক দাহ[৭]।
কানুক দোখে[৮] যো ধনি রোখয়ে[৯]
সোই তাপিনী জগমাহ[১০] ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি[১১]।
সো অব মনসিজ- শরে[১২] ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি[১৩] ॥
ধৈরয লাজ মান সঞে ভাঙ্গল[১৪]
জীবন রহত সন্দেহ[১৫]।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি[১৬]
কানুক ঐছন নেহ[১৭] ॥

১। অন্ধ প্রেম ; ২। গোড়ার দিকে আমি সচেতন ছিলাম না ; ৩। শ্রীকৃষ্ণ যে বহুজনের বল্লভ ; [রাধা বলছেন, কৃষ্ণের প্রেমে অন্ধ হ'য়ে কৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না] ; ৪। আদর পাবার ইচ্ছায় ;

৫। তাঁর সঙ্গে বিবাদ করে'; ৬। দিনরাত প্রাণের জ্বালায় জ্বলেছি; ৭। সখি। তোমাকে মনের জ্বালার কথা বললাম; ৮। কৃষ্ণের দোষ; ৯। যে সুন্দরী রাগ করে; ১০। জগতের মধ্যে সেই নিজেই তাপিত হয়। ১১। কানুর মিনতি উপেক্ষা করে; ১২। মদনদেবের কুসুমশরে; ১৩। এখন তার দেখা পাই না; ১৪। মান চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য এবং লজ্জা দুটোই চলে গেলো; ১৫। এই অবস্থায় কতদিন বেঁচে থাকবো, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে অর্থাৎ মান ছিল বলে কৃষ্ণবিরহে ধৈর্য ও লজ্জাকে বেঁধে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন মানের শেষে কৃষ্ণবিরহের জ্বালায় ধৈর্য ও লজ্জা ভেঙে গেছে। এ অবস্থায় বাঁচবো কতদিন? ১৬। হে সুন্দরী নারী; ১৭। কানুর প্রেমের রীতিই এই রকম।

৪৩

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে[১] হিয়ার পুতলী[২] ॥
পীত পিন্ধন মোর[৩] তুয়া অভিলাষে[৪]।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে[৫] ॥
রাই কত পরখসি[৬] মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার[৭] ॥
লেহ[৮] লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর[৯]।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর[১০] ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি[১১]।
বিহি[১২] নিরমিল[১৩] তুয়া পিরীতি-পুতলী[১৪] ॥

এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ[১৫]।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

[রাধা মান করেছেন। তাই মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণ অনুরোধ করছেন।]

১। তোমার চোখের নাচনে; ২। আমার হৃদয়ও নেচে ওঠে; ৩। আমার পীতবস্ত্র পরিধান; ৪। তোমারই মনোরঞ্জনের জন্য, [কারণ তুমি গৌরবর্ণা. পীতবস্ত্র পরিধান করলে তোমার কথাই মনে পড়বে] ; ৫। আমার প্রাণ (বেদনায়) চমকে ওঠে, যদি তুমি একবার নিঃশ্বাস (দীর্ঘশ্বাস) ফেলো; ৬। পরীক্ষা; ৭। জগতের সকলেই জানে তোমার জন্য আমার আরাধনার কথা; ৮। নাও; ৯। বিভোর হলো; ১০। তোমার চোখের কাজল পরের চিত্ত চুরি করতে দক্ষ; ১১। অগ্রগণ্যা; ১২। বিধাতা; ১৩। নির্মিত করলো; ১৪। প্রেমের পুতুল (আধার); ১৫। রূপযৌবনের এতো সম্পদে যে ধনী, সে কেন এত কৃপণ আমাকে প্রেম দিতে?

নিবেদন

৪৪

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে[১] দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ[২] লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে[৩]
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে[৪] যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি[৫]॥

১। পিতৃকুল ও পতিকুল ; ২। আশ্রয় নিলাম ; ৩। সরলা (খলতাশূন্য যা) ; ৪। পলকমাত্র ; ৫। গলায় হার করে' পরি, যেন মুহূর্তের জন্য তোমাকে হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন না করতে হয়।

৪৫

বঁধু[১] তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে[২] সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম[৩] অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥

পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন[৪] ভায়[৫] ॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত[৬]
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি[৭] চরণখানি ॥

১। প্রিয়তম; ২। তোমাকে; ৩। আমি; ৪। অন্য; ৫। ভাল প্রকাশিত হয় না; ৬। জ্ঞাত; ৭। পাপ-ই হোক্, পুণ্য-ই হোক্ আমার কাছে দুই সমান, কেননা তোমার চরণযুগল-ই আমার কাছে সব। তোহারি—তোমারি।

৪৬

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে[১]।
হেন মনে করি ও তুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে[২] অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ॥
নয়নের অঞ্জন[৩] অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা[৪]।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা[৫] ॥

১। তোমার রূপ-ই আমার রূপ অর্থাৎ তোমাকে ভালবেসে আমি মহিমান্বিতা, তোমার জন্যই আমার যা কিছু রূপ সৌন্দর্য, গর্ব, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। ২। আছে; ৩। কাজল; ৪। কালাচাঁদ; ৫। তোমার প্রেম মনের সঙ্গে বাঁধা।

মাথুর

৪৭

অব[১] মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল[২] ॥

গোকুলে উছলল[৩] করুণাক রোল[৪]।
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল[৫] ॥
শূন ভেল[৬] মন্দির[৭] শূন ভেল নগরী[৮]।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি[৯] ॥
কৈছনে[১০] যায়ব যমুনা তীর।
কৈছে নেহারব[১১] কুঞ্জ কুটীর ॥
সহচরী সঞে[১২] যাঁহা[১৩] কয়ল[১৪] ফুল-খেরি[১৫]।
কৈছনে জীয়ব[১৬] তাহি নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি[১৭] তঁহি[১৮] রহু[১৯] কান ॥

১। এখন; ২। কে হরণ করে' নিল; ৩। উচ্ছলিত; ৪। করুণার বা শোকের হাহাকার (কান্নার রোল); ৫। চোখের জলের ঢেউ বয়ে চলেছে; ৬। শূন্য হ'য়ে গেলো; ৭। গৃহ; ৮। দেশ; ৯। সকল; ১০। কেমন করে'; ১১। কি করে' দেখ্‌বো? (কারণ কৃষ্ণ বিনা কুঞ্জ-কুটিরের দিকে তাকানো যায় না); ১২। সঙ্গে; ১৩। যেখানে; ১৪। করলো; ১৫। ফুল-খেলা (ফুল বাগানে প্রমোদ করা); ১৬। কেমন করে' জীবন-ধারণ করবো; ১৭। লুকিয়ে; ১৮। সেখানে; ১৯। রয়েছেন অর্থাৎ বিদ্যাপতি বলছেন, কানু তো চিরকালের জন্য চলে যাননি। হে রাধা! শোনো! তিনি কৌতুক করবার জন্য সেখানে গিয়ে লুকিয়ে আছেন।

৪৮

অঙ্কুর তপন- তাপে[১] যদি জারব[২]
কি করব বারিদ মেহে[৩]।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব[৪]
কি করব সো পিয়া-লেহে[৫] ॥

হরি হরি কো ইহ[৬] দৈব দুরাশা[৭]।

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব

কো[৮] দূর করব পিয়াসা[৯] ॥

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব

শশধর বরিখব আগি[১০]।

চিন্তামণি[১১] যব নিজগুণ ছোড়ব

কি মোর করম অভাগি[১২] ॥

শ্রাবণ মাহ[১৩] ঘন বিন্দু না বরিখব[১৪]

সুরতরু[১৫] বাঁঝকি ছন্দে।

গিরিধর[১৬] সেবি ঠাম[১৭] নাহি পাওব

বিদ্যাপতি রহু ধন্দে[১৮] ॥

১। সূর্যের উত্তাপে; ২। পুড়ে যায় অর্থাৎ অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি পুড়ে যায় সূর্যতাপে। ৩। জলবাহী মেঘে; ৪। কাটাবো; ৫। প্রিয়তমের ভালবাসা (স্নেহ) পরে পেয়ে কি হবে? ৬। এখানে; ৭। দুর্দশা, দুঃখ। কোন্ দুর্দৈব এমন দুর্দশা ঘটালো; ৮। কোন্ (বস্তু)? ৯। পিপাসা; ১০। চন্দন-গাছ যদি গন্ধ বিতরণ করা ছেড়ে দেয়, চন্দ্র যদি আগুন (আগি) বর্ষণ (বরিখব) করে, সে তো পরম দুর্ভাগ্য। ১১। এই মূল্যবান মণি যদি নিজের গুণ ছেড়ে দেয়। চিন্তামণিরত্নের গুণ হল, একে ধারণ করে' যা চিন্তা করা যায়, তাই সহজ-লভ্য হয়ে ওঠে। ১২। অভাগ্য; ১৩। মাস; ১৪। বর্ষণ (মেঘ যদি শ্রাবণ মাসে এক বিন্দু বর্ষণ না করে); ১৫। কল্পতরু; ১৬। শ্রীকৃষ্ণ (যিনি গোবর্ধন-গিরি ধারণ করে' সমস্ত গোকুলকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন); ১৭। ঠাঁই; ১৮। ধাঁধাঁয়; (বিদ্যাপতির কাছে এটা একটা রহস্য)।

[সমুদ্রের নিকটে গিয়েও তৃষ্ণার্থ হয়ে ফিরে আসা, চন্দনবৃক্ষের কাছে গন্ধ না পাওয়া, চন্দ্রের কিরণে অগ্নির উত্তাপ, শ্রাবণের মেঘে একবিন্দু জল না পাওয়া, চিন্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি কৃষ্ণকে সেবা করেও ফল না পাওয়ার মতোই রহস্যজনক বিদ্যাপতির কাছে।]

৪৯

এ সখি[১] হামারি[২] দুখের নাহি ওর[৩]।

এ ভরা বাদর[৪] মাহ[৫] ভাদর[৬]

শূন্য মন্দির[৭] মোর॥

ঝম্পি[৮] ঘন[৯] গর- জন্তি[১০] সন্ততি[১১]

ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া[১২]।

কান্ত পাহুন[১৩] কাম দারুণ

সঘনে খর শর হন্তিয়া[১৪]॥

কুলিশ[১৫] শত শত পাত মোদিত[১৬]

ময়ূর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী[১৭] ডাকে ডাহুকী[১৮]

ফাটি যাওত ছাতিয়া[১৯]॥

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক[২০] পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি[২১]

হরি বিনে দিন রাতিয়া[২২]॥

১। সখি হে (পাঠান্তর); ২। আমারি; ৩। সীমা; ৪। বাদল; ৫। মাস; ৬। ভাদ্র; ৭। গৃহ। ভাদ্র মাস, ভরা বাদল, আমার গৃহে কেউ

হরি হরি কো ইহ[৬] দৈব দুরাশা[৭]।

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো[৮] দূর করব পিয়াসা[৯] ॥

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি[১০]।

চিন্তামণি[১১] যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি[১২] ॥

শ্রাবণ মাহ[১৩] ঘন বিন্দু না বরিখব[১৪]
সুরতরু[১৫] বাঁঝকি ছন্দে।

গিরিধর[১৬] সেবি ঠাম[১৭] নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে[১৮] ॥

১। সূর্যের উত্তাপে ; ২। পুড়ে যায় অর্থাৎ অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি পুড়ে যায় সূর্যতাপে। ৩। জলবাহী মেঘে ; ৪। কাটাবো ; ৫। প্রিয়তমের ভালবাসা (স্নেহ) পরে পেয়ে কি হবে ? ৬। এখানে ; ৭। দুর্দশা, দুঃখ। কোন্ দুর্দৈব এমন দুর্দশা ঘটালো ; ৮। কোন্ (বস্তু) ? ৯। পিপাসা ; ১০। চন্দন-গাছ যদি গন্ধ বিতরণ করা ছেড়ে দেয়, চন্দ্র যদি আগুন (আগি) বর্ষণ (বরিখব) করে, সে তো পরম দুর্ভাগ্য। ১১। এই মূল্যবান মণি যদি নিজের গুণ ছেড়ে দেয়। চিন্তামণিরত্নের গুণ হল, একে ধারণ করে' যা চিন্তা করা যায়, তাই সহজ-লভ্য হয়ে ওঠে। ১২। অভাগ্য ; ১৩। মাস ; ১৪। বর্ষণ (মেঘ যদি শ্রাবণ মাসে একবিন্দু বর্ষণ না করে) ; ১৫। কল্পতরু ; ১৬। শ্রীকৃষ্ণ (যিনি গোবর্ধন-গিরি ধারণ করে' সমস্ত গোকুলকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন) ; ১৭। ঠাঁই ; ১৮। ধাঁধাঁয় ; (বিদ্যাপতির কাছে এটা একটা রহস্য)।

[সমুদ্রের নিকটে গিয়েও তৃষ্ণার্থ হয়ে ফিরে আসা, চন্দনবৃক্ষের কাছে গন্ধ না পাওয়া, চন্দ্রের কিরণে অগ্নির উত্তাপ, শ্রাবণের মেঘে একবিন্দু জল না পাওয়া, চিন্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি কৃষ্ণকে সেবা করেও ফল না পাওয়ার মতোই রহস্যজনক বিদ্যাপতির কাছে।]

৪৯

এ সখি[১] হামারি[২] দুখের নাহি ওর[৩]।

এ ভরা বাদর[৪] মাহ[৫] ভাদর

শূন্য মন্দির[৭] মোর॥

ঝম্পি[৮] ঘন[৯] গর- জন্তি[১০] সন্ততি[১১]

ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া[১২]।

কান্ত পাহুন[১৩] কাম দারুণ

সঘনে খর শর হন্তিয়া[১৪]॥

কুলিশ[১৫] শত শত পাত মোদিত[১৬]

ময়ুর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী[১৭] ডাকে ডাহুকী[১৮]

ফাটি যাওত ছাতিয়া[১৯]॥

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক[২০] পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি[২১]

হরি বিনে দিন রাতিয়া[২২]॥

১। সখি হে (পাঠান্তর); ২। আমারি; ৩। সীমা; ৪। বাদল; ৫। মাস; ৬। ভাদ্র; ৭। গৃহ। ভাদ্র মাস, ভরা বাদল, আমার গৃহে কেউ

নেই, আমি একা ; ৮। ঝেঁপে, দশদিক পরিব্যাপ্ত করে ; ৯। মেঘ ; ১০। গর্জন করছে ; ১১। সর্বদা ; ১২। বর্ষার অবিরত বর্ষণ ; ১৩। প্রবাসী, পাষাণ ; ১৪। তীক্ষ্ণশর (কামশর) নিক্ষেপ করছেন নিষ্ঠুর কামদেব ; ১৫। বজ্র ; ১৬। আমোদিত, আনন্দিত। শত শত বজ্রপাতে ময়ূর আনন্দে নৃত্য করছে। ১৭। ব্যাঙ্, ভেক ; ১৮। জলচর পক্ষিনী বিশেষ (ডাকপাখী) ; ১৯। বুক ; কামের আঘাতে বিরহের যন্ত্রণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ; ২০। অস্থির (অথির) বিজলীর (বিদ্যুৎ) সারি (পংক্তি/শ্রেণী) আকাশে যেন ছুটোছুটি করছে ; ২১। যাপন করবে ; একাকী দিনরাত কাটাবে কেমন করে ? ২২। রাত্রি।

[কোনও কোনও প্রাচীন সঙ্কলক এই পদটিকে "রায়শেখর" ভণিতাযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।]

৫০

চির[১] চন্দন উরে[২] হার না দেলা[৩]।
সো অব[৪] নদী-গিরি আঁতর ভেলা[৫] ॥
পিয়াক[৬] গরবে হাম[৭] কাহুক[৮] না গনলা[৯]।
সো পিয়া বিনা মোহে[১০] কে কি না কহলা[১১] ॥
বড় দুখ রহল[১২] মরমে।
পিয়া বিছুরল[১৩] যদি কি আর জীবনে[১৪] ॥
পূরব[১৫] জনমে বিহি[১৬] লিখিল ভরমে[১৭]।
পিয়াক দোখ নাহি[১৮] যে ছিল করমে[১৯] ॥
আন[২০] অনুরাগে[২১] পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর[২২] ঝাঁঝর[২৩] ভেলা[২৪] ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী[২৫]।
ধৈরজ[২৬] ধরহ চিতে[২৭] মিলব মুরারি[২৮]॥

১। চির<চীর কাপড়ের ফালি; ২। বক্ষে; ৩। হার পরতাম না অর্থাৎ যাঁর সঙ্গে মিলনে এতটুকু বাধা হবার আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন ও হার পরিনি, সেই প্রিয়তম এখন নদী-পর্বতের ব্যবধান রচনা করেছেন; ৪। সে এখন; ৫। অন্তর/ব্যবধান হলো; ৬। প্রিয়-র; ৭। আমি; ৮। কাউকে; ৯। গণনা করিনি অর্থাৎ ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি; ১০। আমাকে; ১১। কে কি না বলেছে অর্থাৎ এর জন্য আমাকে অনেক কটু কথা সহ্য করতে হয়েছে; ১২। রইল; ১৩। বিস্মৃত হলো, যদি আমায় ভুলেই গেলো; ১৪। বেঁচে থেকে লাভ কি? ১৫। পূর্ব; ১৬। বিধি; ১৭। ভুলক্রমে; ১৮। প্রিয়ের কোনও দোষ নেই; ১৯। আমার কর্মফল যা ছিল, তাই ফলেছে; ২০। অন্য, ২১। অন্যকে ভালবেসে; ২২। পাঁজরা; ২৩। ঝাঁঝরা, ছিদ্রময়; ২৪। হলো; ২৫। সুন্দরী নারী; ২৬। ধৈর্য; ২৭। চিত্তে; ২৮। কৃষ্ণকে পাবে।

৫১

নামহি[১] অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম[২]
সো আওল ব্রজ-মাঝ[৩]।
ঘরে ঘরে ঘোষই[৪] শ্রবণ-অমঙ্গল[৫]
কালি কালিহুঁ সাজ[৬]॥
সজনি[৭], রজনী পোহাইলে কালি[৮]।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর[৯]
মন্দিরে রহু বনমালী[১০]॥

যোগিনী-চরণ[১১] শরণ করি সাধহ[১২]
বান্ধহ যামিনীনাথে[১৩]।
নখতর চাঁদ[১৪] বেকত রহু অম্বরে[১৫]
যৈছে নহত পরভাতে[১৬] ॥
কালিন্দী দেবী সেবি[১৭] তাহে ভাখহ[১৮]
সো রাখই নিজ তাতে[১৯]।
কিয়ে সমন আনি[২০] তুরিতে মিলাওব[২১]
গোবিন্দদাস অনুমাতে[২২] ॥

১। নামেই শুধু অক্রুর (সরল); ২। যার তুল্য ক্রূর (কঠোর) কেউ নেই জগতে; ৩। সেই ব্যক্তি আজ বৃন্দাবনে এসেছেন; ৪। ঘরে ঘরে ঘোষণা করছেন; ৫। শ্রবণে যা অশুভ, কটু; ৬। কালকে, ঠিক কালকেই যাবার জন্ত তৈরি হও (সাজগোজ কর) [মথুরায় যাবার জন্য]; ৭। শ্রীরাধা এসব কথা তার সখীকে সম্বোধন করে' বলেছে; ৮। এই রাত পোহালেই তো সেই 'কাল' দেখা দেবে; ৯। এমন একটা উপায় বের কর, যাতে প্রভাত না হ'তে পারে; ১০। গৃহে যেন শ্রীকৃষ্ণ থেকে যান; ১১। যোগিনীর চরণ; ১২ আশ্রয় ক'রে, সাধ্য-সাধনা কর; ১৩। চন্দ্রকে বেঁধে রেখে দাও (যাতে তিনি চাঁদকে বেঁধে রেখে দেন—তা'হলেই প্রভাত হবে না); ১৪। নক্ষত্র ও চাঁদ; ১৫। আকাশে প্রকাশিত (ব্যক্ত) হয়ে থাক্; ১৬। যাতে প্রভাত না হয় দেহ ১৭। (যোগিনী দেবী যদি তা না পারেন বা কথা না শোনেন) তা হ'লে যমুন দেবীকে তুষ্ট করে'; ১৮। তাঁকেই বলো (ভাষা>ভাখ্); ১৯। তিনি যেন সূর্যকে (তাঁর পিতা) আটকে রেখে আকাশে প্রকাশ হ'তে না দেন। [এ হ'লেই সকাল হবে না অর্থাৎ 'কাল'-কে আসার পথ আটকে রাখা যাবে] ২০। (যমুনাদেবী রাজি না হ'লে) তা হ'লে যমরাজকে ডেকে আনো; ২১

তাঁর সঙ্গে এক্ষুণি মিলিত হবো অর্থাৎ তা 'হ'লে এক্ষুণি আমি মৃত্যুবরণ করবো ; ২২। পদকর্তা গোবিন্দদাস অনুমান করেন শ্রীরাধার মনোভাব এরকমই হ'য়েছিল।

৫২

প্রেমক অঙ্কুর জাত[১] আত ভেল[২]
না ভেল যুগল পলাশা[৩]।
প্রতিপদ-চাঁদ[৪] উদয় যৈছে যামিনী[৫]
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা[৬] ॥
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধাই[৭]।
অবধি[৮] রহল বিছুরাই[৯] ॥
কো জানে[১০] চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব[১১]
মাধবী মধুপ সুজান[১২]।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে[১৩]
বিঘটিত[১৪] বিহি-নিরমাণ[১৫] ॥
পাপ পরাণ আন[১৬] নাহি জানত[১৭]
কানু কানু করি ঝুর[১৮]।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব[১৯]
গোবিন্দদাস রস-পুর ॥

১। প্রেমের অঙ্কুর জন্মলাভ (জাত); ২। রৌদ্রের তাপ (আত) পেলো ; ৩। না পেলো দু'টি পল্লব মেলবার-ও সুযোগ অর্থাৎ মনে প্রেমের জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে নানা বাধারূপ তাপ প্রেমের কচি দু'টি পাতা মেলবার

(আত্মপ্রকাশ করার) সুযোগ-ও পেল না; ৪। প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদ; ৫। রাত্রিতে উদিত হ'লে যেমন অবস্থা হয় অর্থাৎ অন্ধকার কাটে না; ৬। কণামাত্র সুখ না পেয়ে তা নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গেল; ৭। মাধব, আমার প্রতি নিষ্ঠুরভাবাপন্ন; ৮। মিলনের প্রতিশ্রুতি (অবধি); ৯। ভুলে রইল; ১০। কেউ কি জানে অর্থাৎ ভাব্‌তে পেরেছে; ১১। চাঁদ চকোরকে বঞ্চিত করবে; ১২। মাধবী মৌমাছিকে বিরূপ করবে; ১৩। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের রীতি দেখে অনুভব করছি এবং অনুমান করছি; ১৪। অঘটন ঘট্‌বে। ১৫। বিধির বিধান; [শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের অস্বাভাবিক প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, বিধাতা বুঝি সব রীতিনীতি উলোট-পালট করে দিয়েছেন। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেম জানাবে না, এতো সৃষ্টিছাড়া নিয়ম। তাই শ্রীকৃষ্ণের আচরণ দেখে প্রেমিকা শ্রীরাধার একে সৃষ্টিছাড়া বলেই মনে হচ্ছে।]; ১৬। অন্য কিছু; ১৭। জানে না; ১৮। কৃষ্ণের নাম করে' করে' অশ্রুসজল হয়ে উঠতো; ১৯। করুণাহীন মাধব।

৫৩

যাঁহা পহু[১] অরুণ-চরণে[২] চলি যাত।
তাঁহা তাহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত[৩] ॥
যো দরপণে[৪] পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই[৫] তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ[৬]।
ঐছনে মিলই[৭] যব গোকুল-চন্দ ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ[৮]।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই[৯] তথি মাহ[১০] ॥
যো বীজনে[১১] পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥

যাঁহা পহু ভরমই[১২] জলধর-শ্যাম[১৩]।
মঝু অঙ্গ গগন হোই[১৪] তছু ঠাম[১৫] ॥

গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু[১৬] তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥

শ্রীরাধার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—বিরহ ও মৃত্যু কোন্‌টি অধিক কাম্য? অবশেষে শ্রীরাধা মৃত্যুকেই অধিক বরণীয় মনে করলেন। কিন্তু মৃত্যু হ'লে দেহ তো পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ তো ভোগ করা হবে না। এই দ্বন্দ্বে রাধার চিত্ত যখন আকুল, তখন তিনি নিজেই সমাধান করলেন—মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে হলো। তাই তিনি কামনা করলেন—

১। প্রিয়তম; প্রভু; ২। গোলাপী আভাযুক্ত চরণে; ৩। সেই সেই জায়গায় (ক্ষিতি/মাটিতে) তাঁর দেহ মাটিতে মিশে থাকবে, যেখানে কৃষ্ণ প্রতিদিন যাতায়াত করেন; [পঞ্চভূতে দেহ বিলীন হ'লে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ অংশে ছড়িয়ে থাকবে মৃত্যুর পর]; ৪। যে আয়নায়; ৫। জ্যোতি হয়ে, আলো হয়ে (তেজ) সেখানে থাক্‌বে; ৬। হে সখি! বিরহ ও মৃত্যুর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চল্‌ছিল, তার আজ অবসান হলো। ৭। এভাবেই মিলিত হবো; ৮। স্নান করেন; ৯। আমার দেহাংশ জল হয়ে সেই সরোবরে থাক্‌বে (অপ্‌); ১০। তার ভেতরে; ১১। যে বাতাসে (মরুৎ) শ্রীকৃষ্ণ দেহে (গাত<গাত্র) বাতাস খান; ১২। বিচরণ করেন; ১৩। শ্যাম-জলধর অর্থাৎ নীল আকাশ যেখানে তাঁর বিচরণক্ষেত্র; ১৪। আকাশ হ'য়ে (ব্যোম); ১৫। তাঁর নিকট; ১৬। পান্না-তুল্য দেহ।

ভাবোল্লাস ও মিলন

৫৪

আজু রজনী হাম ভাগে[১] পোহায়লুঁ
পেখলুঁ[২] পিয়া-মুখ-চন্দা[৩]।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল[৪] নিরদন্দা[৫] ॥
আজু মঝু[৬] গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি[৭] মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল[৮] সবহুঁ[৯] সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা[১০] ॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা[১১] ॥

পাঠান্তর : ১। অব হন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
২। আজু শুভদিন সখী মঝু পরি হোয়ল
অর্থাৎ এখন যখন আমি প্রিয়র সঙ্গে মিলিত হলাম, নিজের দেহদানে আমি সম্মত।

১। বহু ভাগ্যে ; ২। দেখ্‌লাম ; ৩। প্রিয়তমের মুখচন্দ্র (চাঁদের মত মুখ) ; ৪। হলো ; ৫। নির্দ্বন্দ্ব ; ৬। আমার (আজ আমার গৃহকে গৃহ বলে মেনে নিলাম, আজ আমার দেহকে দেহ বলেই মনে হচ্ছে) ; ৭। বিধাতা ; ৮। দূর হলো : ৯। সমস্ত ; ১০। সেইসব কোকিল এখন ডাকুক না লক্ষবার, এখন উদিত হোক্ না কেন লক্ষ চন্দ্র, পঞ্চশর আজ লক্ষ শর হয়ে উঠুক্ এবং মলয় পবন মন্দ মন্দ বয়ে যাক্, কারণ প্রিয়তম কৃষ্ণকে না দেখে এইসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনন্দ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ প্রিয়তমকে কাছে পেয়েছি, তাই····। ১১। স্নেহ।

৫৫

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর[১]।
চিরদিনে মাধব[২] মন্দিরে[৩] মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে[৪] তত সুখ ভেল[৫] ॥
আঁচর[৬] ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব[৭] হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী[৮] পিয়া গীরিষির বা[৯]।
বরিষার ছত্র [১০] পিয়া দরিয়ার না[১১] ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি[১২]।
সুজনক[১৩] দুখ দিবস দুই-চারি ॥

[জনৈক পণ্ডিতের মতে, "পদটি শান্তিপুর নিবাসে সমাগত সদ্য সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে লক্ষ্য করে অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক গীত।"]

১। সীমা; ২। বিশ্বপিতা (এই শব্দটি বিদ্যাপতি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন); এখানে কৃষ্ণ; ৩। গৃহে; ৪। প্রিয়তমের মুখদর্শন করে'; ৫। হলো; ৬। আঁচল; ৭। তবুও; ৮। ওড়না, গাত্রাবরণ; ৯। গ্রীষ্মের বাতাস; ১০। বর্ষার ছাতা, ১১। নদীর জলে পারাপারের নৌকা; ১২। সুন্দরী স্ত্রী; ১৩। সুজন যে।

৫৬

পিয়া[১] যব[২] আওব[৩] এ মঝু গেহে[৪]।
মঙ্গল যতহুঁ[৫] করব নিজ দেহে[৬]॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গনে[৭]।
ঝাড়ু[৮] করব তাহে চিকুর বিছানে[৯]॥
আলিপনা দেওব[১০] মোতিম হার[১১]।
মঙ্গল-কলস[১২] করব কুচভার[১৩]॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব[১৪]।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প[১৫]॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট[১৬]।
চৌদিকে পসারব চাঁদক হাট[১৭]॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ[১৮]।
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ[১৯]॥

পদটি বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলির অন্যতম এবং ভাব-সম্মেলনের পদ হিসেবে উচ্চাঙ্গের।

১। প্রিয়তম, ২। যখন; ৩। আসবে; ৪। আমার গৃহে; ৫। যত রকমের মঙ্গলানুষ্ঠান আছে; ৬। নিজের দেহকেই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নেবো; ৭। আমার দেহটিকেই আমি প্রিয়তমের জন্ত বেদি করবো;

৮। ঝাঁট দেবো ; ৯। (নিজের) চুল বিছিয়ে দিয়ে ; ১০। আল্পনা দেবো ; ১১। মুক্তার মালা ; ১২। উৎসব-গৃহদ্বারে যে দু'টি মঙ্গল কলস থাকে ; ১৩। নিজের স্তনদ্বয় সেই মঙ্গল কলসরূপে ব্যবহার করবো ; ১৪। নিজের ভারী নিতম্বদেশ হবে কদলীবৃক্ষসদৃশ, এটাও—উৎসবগৃহে অপরিহার্য ; ১৫। আমার কিঙ্কিণি (ঘুমুর বা নূপুর) আন্দোলিত হবে আম্রপল্লব সদৃশ ; ১৬। উৎসব-গৃহে বহু নারীর সমাবেশ হয়ে থাকে। আমি এমনভাবে আমার লীলাকলা বিস্তার করবো যে (প্রিয়তমের কাছে) মনে হবে বহু রমণী সমবেত হয়েছে চারপাশে ; ১৭। চারদিকে এমন রূপের মোহ প্রসারিত করবো যে মনে হবে যেন চাঁদের হাট বসেছে (বহু সুন্দরী রমণীর একত্র সমাবেশ হয়েছে) ; ১৮। আশা পূর্ণ হবে ; ১৯। অতি সত্বর প্রিয়তম তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন।

এই উক্তি বা আবেগ শ্রীরাধা প্রকাশ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার তীব্র আনন্দের প্রত্যাশায়। কবি বিদ্যাপতি তাই তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন। এ তো গেল ভাবের দিক্। তত্ত্বের বিচারে আমরা বলতে পারি, এ যেন জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছে। সাধকের দেহই সমস্ত কিছু মঙ্গলানুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্র অর্থাৎ তাঁর দেহই বেদী, নিজের কেশ-ই ঝাঁটার পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে, সাদা মুক্তার মালাই হবে আল্পনা ইত্যাদি।

The human body is the highest temple of God :—এ সত্যই তো এখানে কবি বিবৃত করেছেন। বহুদিন যাঁকে প্রত্যাশা করেছি, সেই প্রিয়তমকে (কৃষ্ণকে) পাবার অধীর আনন্দকে বা ভাবোল্লাসকে কবি রাধার (নায়িকা) আবেগের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

৫৭

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল[১]।

মাধব মন্দিরে[২] তুরিতে আওব[৩]

কপাল কহিয়া গেল[৪] ॥

চিকুর ফুরিছে[৫] বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার[৬] ।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে[৭]
দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময় কাক-কোলাহলি[৮]
আহার বাঁটিয়া খায় ।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়[৯] ॥
মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে[১০]
দেবের মাথার ফুল[১১] ।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ[১২]
বিহি ভেল অনুকূল ॥[১৩]

১। সখি! কুদিন সুদিনে পরিণত হলো; ২। গৃহে; ৩। শীঘ্রই আসবেন; ৪। আমার অদৃষ্ট যেন বলে' গেলো আমাকে। (ভাগ্যগণনাকারী আমাকে জানিয়ে গেলো); ৫। (আনন্দে) আমার চুলগুলি স্ফুরিত হচ্ছে; ৬। যৌবন-ভার যেন পুলকের সঞ্চার করছে—এতোদিন যাকে বোঝা বলে' মনে করতাম; ৭। বাঁ চোখ নাচা মেয়েদের পক্ষে শুভলক্ষণ—এমনই একটি সংস্কার প্রচলিত আছে; ৮। কাকেরা কোলাহল করে' খাদ্য ভাগাভাগি করে খাচ্ছে; [কাক ভবিষ্যদ্বক্তা নামে উক্ত হয়। কাকের বিভিন্ন প্রকার ডাক শুনে নাকি শুভ-অশুভ ইঙ্গিত বোঝা যায়। সেই কাকের কাছে প্রিয়তমের আগমনবার্তা শোন্‌বার জন্য রাধা কত প্রশ্ন করেছে। কিন্তু কাকেরা খাবার খেয়ে চলে যায়, রাধার জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন শুভ-ইঙ্গিত জানায় না।] ৯। কিন্তু আজ তাদের যখন প্রিয়তমের আসবার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কাকেরা কাছে এসে উড়ে বস্‌লো। ১০। আনন্দের আতিশয্যে মুখের পান আপনাআপনি খসে পড়ছে; ১১। দেবতার মাথার থেকে ফুলগুলিও খসে পড়ছে; ১২। সব শুভ হলো; ১৩। কারণ বিধাতা অনুকূল হয়েছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী

কাব্য-পাঠ

গৌরাঙ্গ বিষয়ক

'গৌরচন্দ্রিকা' মাত্রেই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ, কিন্তু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদমাত্রেই গৌরচন্দ্রিকা নয়। ব্যাপকার্থে বলা যেতে পারে, শ্রীচৈতন্যের লৌকিক জীবনের কাহিনী নিয়ে যেসব পদ রচিত হয়েছে, তা গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ এবং শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের কাহিনী নিয়ে যেসব পদ রচিত হয়েছে, তাকে বলা যেতে পারে গৌরচন্দ্রিকা। ঈশ্বর স্বয়ং নিজ মহিমা প্রচার ও রসাস্বাদনের জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবিরা একথা বিশ্বাস করতেন। শ্রীচৈতন্যজীবনী রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই শ্রেণীর পদগুলিই ছিল মহাপ্রভুর লৌকিক জীবনের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনার মাধ্যম। মহাপ্রভুর মধ্যে বাঙালী আবিষ্কার করলো মানব-মহিমা। এর পূর্বে ও সমসাময়িককালে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাই ছিল সাহিত্যের উপজীব্য। শ্রীচৈতন্যই প্রথম মানুষ যাঁর কথা কবিরা দেবদেবীর পাশাপাশি সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। 'গৌরচন্দ্রিকা' বর্তমানে ভূমিকা বা মুখবন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এই পদ শুনে শ্রোতারা বুঝে নেবেন, কোন্ রসপর্যায়ের পালাগান গীত হবে। শ্রীচৈতন্যের মানবলীলা আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের সেই রসলীলায় পদ আস্বাদ করতেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। পণ্ডিত সমালোচক নরোত্তম দাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন— "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তাঁহার হৃদয় নির্মল হয়, এইজন্যই গৌরচন্দ্রিকার রস আস্বাদনের মধ্য দিয়া আমাদের রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃতিক লীলারস আস্বাদনের অধিকার জন্মে····।"

"যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ কোন পালাকীর্তনের ভূমিকা হিসাবে গীত হয় এবং যাহার মাধ্যমে ব্রজলীলায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়।" গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলাই পদকর্তাদের সমধিক আকৃষ্ট করেছিল বলেই তাঁরা এই পদগুলিকে বলতেন।'গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্যচন্দ্রিকা নয়'।

১

আজিকার স্বপনের কথা……

বাসুদেব ঘোষ এই পদটির রচয়িতা। পদটিতে শচীমাতার বাৎসল্যভাব প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী শচীদেবীর অন্তরঙ্গ সখী ছিলেন। শ্রীবাসের আঙিনায় মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিতে ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন। সন্ন্যাসের পর গৌরাঙ্গকে শচীমাতা একদিন স্বপ্নে দেখলেন। সেই কথা শোনাবার জন্য মালিনী সখীকে একদিন প্রভাতে শচীমাতা বলছেন, সখি! আজকের স্বপনের কথা শোনো। আমার নিমাই ঘরে এসেছিল। উঠোনে দাঁড়িয়ে সে ঘরের দিকে তাকিয়ে আমাকে 'মা' বলে ডাকলো। ঘরে শুয়েছিলাম —নিমাইয়ের গলার সাড়া পেয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বের হয়ে এলাম। নিমাই আমার পদধূলি মাথায় তুলে নিল, আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মাগো! তোমার ভালবাসার টানে আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই বটে, কিন্তু নীলাচলে থাকতে পারলাম না। তোমাকে দেখবার জন্য নদীয়াপুরে এলাম—কাঁদতে কাঁদতে সে একথাই বললো। 'বাছা আমার এসো' বলে' তাকে বুকের মধ্যে তুলে নিতে গিয়েছি, এমন সময়ে ঘুম গেলো ভেঙে। আবার তাকে দেখতে না পেয়ে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে। তাই কাঁদতে কাঁদতেই রাত কেটে গেলো। সেই থেকে প্রাণ আমার কাঁদছে। হৃদয় স্থির হচ্ছে না—এখন আমি কি করবো, কি উপায় হবে আমার! পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বলছেন, 'মাগো, গৌরাঙ্গ তো তোমারই। সেজন্যই সব সময়েই তুমি তাকে দেখ।

বাসুদেব ঘোষ—শ্রীচৈতন্যের পরম অনুরাগী বল্লভ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র বাসুদেব। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে বাসুদেব গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলাকে কেন্দ্র করে তিনি যেসব পদ রচনা করেছেন, তা আন্তরিকতা ও ঐতিহাসিকতার বিচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "চৈতন্যের বাস্তবজীবন

বিষয়ক বর্ণনায় তাঁহার পদগুলি বাংলা পদসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজনা॥" বাসুদেব চৈতন্য-জীবন কথাকে যে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—তা হ'লো রাধাকৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় চৈতন্যলীলা বর্ণনা করা এবং অপর পর্যায়টি হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব কাহিনী। এই শেষ পর্যায়ের পদরচনায় বাসুদেবের কৃতিত্ব সমধিক। অসিতবাবু বলেছেন—উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যে প্রধান দু'টি লক্ষণ—বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি বাসু ঘোষের তা পুরামাত্রায় ছিল। আলোচ্য পদটি আন্তরিকতায় ও করুণরসে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এ যেন ভাবসম্মেলনের ঢঙে বর্ণিত শচীমাতার স্বপ্ন বৃত্তান্ত। পণ্ডিত সমালোচকের মতে—"বাসু ঘোষের সরল রচনাভঙ্গীর···মানবিক রূপটি আমাদের নিকট অধিকতর উপভোগ্য বোধ হয়।···অথচ ভাষায় কিছুমাত্র রং-রূপের ঐশ্বর্য নাই, অলঙ্কারের উজ্জ্বলতা নাই, নিতান্ত সরল প্রাণের নিরাভরণ উক্তি আমাদের মন জয় করিয়াছে।"

২

আজু হাম কি পেখলু······

পদকর্তা রাধামোহন আলোচ্য পদটিতে শ্রীচৈতন্যকে রাধাভাবে কল্পনা করেছেন। কৃষ্ণের জন্য রাধার যে আকুলতা, তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের এই কাতরতা তুলনীয়। পদকর্তা শ্রীরাধার আকুলতা স্মরণ করে' এখানে মহাপ্রভুকে সেভাবেই চিত্রিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ অন্তর্গত রাধাভাব সম্বলিত পদ।

পদকর্তা বলছেন, আজ আমি নবদ্বীপের চন্দ্র গৌরাঙ্গকে কিভাবে দেখলাম! তিনি হাতের ওপর মুখ রেখে বসে আছেন। মহাপ্রভু একবার ঘরে, একবার পথে যাচ্ছেন। ক্ষণে ক্ষণে একাকী তিনি ফুলবনে চলেছেন। তাঁর ছলছল নয়নপদ্ম বিলাসভরে নব নব ভাব প্রকাশ করছে। পুলকজাত রোমাঞ্চ যেন সমস্ত দেহ ভরে দিয়েছে। পদকর্তা রাধামোহন সেই গভীর প্রেমসমুদ্রের থৈ পেলেন না অর্থাৎ প্রেমসাগরের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে পারলেন না।

রাধামোহন—শ্রীনিবাস আচার্যের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ রাধামোহন ঠাকুর। এঁর পিতার নাম জগদানন্দ। ইনি মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। ইনি যে সঙ্কলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, তাতে ২২৮টি পদ তাঁর নিজেরই রচনা। তাঁর গৌরব পদকর্তা হিসেবে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশী সঙ্কলনগ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে। তাই পণ্ডিতসমাজ গোবিন্দদাসের কবিত্ব আলোচনা করতে গিয়ে রাধামোহনের নাম বারবার স্মরণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত সঙ্কলনগ্রন্থের নাম 'পদামৃতসমুদ্র'। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুধু বৈষ্ণব সমাজে নয়, সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। "পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের জন্য তিনি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের গুরুর স্থান লাভ করেছিলেন।" তাঁর রচনায় গোবিন্দদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বসন……

এই পদে পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বর্ণনা করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পরিচয় জানতে পেরে পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দ সকলেই কিভাবে কাতর হয়ে পড়েছেন—তারই চিত্র।

কিসের জন্য গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর পক্ষে অপরিহার্য দণ্ড ধারণ করেছেন? সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই তো দণ্ড ধারণ করে। কিসের জন্যই বা তিনি গেরুয়া বসন পরিধান করেছেন? কিসের জন্যই বা তিনি মস্তক মুণ্ডিত করেছেন? কিসের জন্য তিনি চাঁদবদনে রাধা-রাধা বলে কেঁদে কেঁদে নিজে দেশ ত্যাগ করলেন। শ্রীবাসের উচ্চরোলে ক্রন্দন ধ্বনিতে পাষাণও গলে মিলিয়ে যায়। গদাধর আর যেন প্রাণে বাঁচবেন না। মুকুন্দের দু'চোখে মন্দাকিনীর ধারার মতো তপ্ত অশ্রু বয়ে চলেছে। হরিদাস সব বৈষ্ণব মহান্তের ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাচ্ছেন সকলকে, কিন্তু তবুও কেউ যেন স্থির থাকতে পারছেন না। গৌরাঙ্গ কেন জলন্ত অগ্নির মতো যৌবনবতী স্ত্রীকে, তাঁর অতুল প্রেমকে উপেক্ষা করলেন? কতো দুঃখের কথা আর বর্ণনা করবো—বল্‌তে গিয়ে হৃদয় বেদনায় ব্যথাতুর হয়ে

ওঠে। সেই বেদনাতুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করেই পদকর্তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। গৌরাঙ্গের বিরহে আকুল সব প্রাণী দিনরাত্রির ভেদ ভুলে গেছে। পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ নিজেও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন।

গদাধর, মুকুন্দ, ইত্যাদিরা শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর ছিলেন।

বাসুদেব ঘোষ—১নং পদের আলোচনায় কবি-পরিচিতি দেওয়া আছে।

৪

চম্পক শোন-কুসুম কনকাচল······

পদকর্তা গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গের দেহলাবণ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, গৌরাঙ্গের দেহলাবণ্য চাঁপা, শোন ফুল (হলুদ বর্ণ) ও সুবর্ণ পর্বতের ঔজ্জ্বল্যকেও পরাজিত করেছে। শচীর পুত্র চৈতন্যদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে পদকর্তা গৌরাঙ্গের রূপমহিমা বর্ণনা করেছেন। তাঁর উন্নত গ্রীবার সৌন্দর্যের সীমা অনুভব করা যায় না—তার ভঙ্গি জগতের মনোহরণকারী। তিনি ত্রিভুবনের শোভা—কলিযুগরূপ কালসর্পের ভয়কে তিনি খণ্ডন করেন। তাঁর সারা দেহে কৃষ্ণপ্রেমের পুলকের জন্য রোমাঞ্চ ব্যাপ্ত হয়েছে—সমস্ত অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হ'য়ে যেন গর গর করছে। তাঁর মুখে মৃদু হাসি, ভাষণ গদ গদ, চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে, যেন কতো মন্দাকিনীর স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নিজ প্রেমরসে মত্ত হয়ে তিনি নিজেই নৃত্যরত, তাঁর চোখ দুটি ভাবে ঢুলুঢুলু আর কত অগণিত ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গানে বৃত। যে প্রেমরসে সমস্ত জগৎ ভেসে যাচ্ছে, পদকর্তা গোবিন্দদাস সেই প্রেমবন্যার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল—এই আক্ষেপ পদকর্তার চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছে।

গোবিন্দদাস—আলোচ্য পদটি কবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদ। এতে পদকর্তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যের প্রতি আত্মনিবেদন ও ভক্তচিত্তের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। অসিতবাবু বলেছেন—"বৈদ্যবংশোৎপন্ন গোবিন্দদাস কবিরাজ (কৌলিক উপাধি সেন) বিচিত্র কবিপ্রতিভা, বিস্ময়কর কারুনির্মিতি,

উদ্বেল আবেগ এবং অচিন্তিতপূর্ব বাকৃপুঞ্জের দ্বারা ধ্বনিকেন্দ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য, ...সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, ভক্তগোষ্ঠী এবং রসিক সমাজে...শ্রদ্ধার্হ আসন লাভ করিয়াছেন।"

গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর সেন কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডে বাস করতেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি নাকি ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন। গোবিন্দদাসের পিতা চৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেন কিছুদিন শ্রীখণ্ডে বাস করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের স্নেহধন্য ছিলেন। তাই ধর্মমতে তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব ছিলেন। মাতামহের শাক্তমত গোবিন্দদাসকে প্রথম পর্বে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু পিতা বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন বলেই হয়তো মাতামহের আশ্রয় ত্যাগ করে' পিতার সঙ্গে তিনি গ্রামান্তরে যান। তবে পিতার অকালমৃত্যুর পর গোবিন্দদাস বড় ভাইয়ের সঙ্গে শ্রীখণ্ডে আবার মাতামহের আশ্রয়ে আসেন। "গোবিন্দদাস বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে তিরোহিত হন।" তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া, পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। একবার কঠিন উদরাময় সংক্রান্ত রোগে মরণাপন্ন গোবিন্দদাস শ্রীনিবাসের কৃপায় নিরাময় হন এবং সপরিবারে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

কবি বা পদকর্তা হিসেবে তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়। তৎসত্ত্বেও তাঁর অপূর্ব পদাবলী আন্তরিকতায়, অলংকরণে ও ভাবসম্পদে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে মুগ্ধ করেছিল এবং বৈষ্ণব সমাজে তিনি ও তাঁর অগ্রজ দু'জনেই যথেষ্ট সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

তিনি কমবেশী আটশো পদ রচনা করেন। একাধিক গোবিন্দদাস ভণিতা-যুক্ত কবির অস্তিত্ব থাকায় মূল কবির অনেক পদ এইভাবে পাঠককে বিভ্রান্ত করে। তবে মূল গোবিন্দদাসের পদে বিদ্যাপতির অনুসরণ, ভাষা ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য অন্য পদকর্তাদের থেকে তাঁকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। গোবিন্দ-দাসের কবিত্ব সম্পর্কে আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি। গোবিন্দদাসের

পদগুলির সংকলনে রাধাকৃষ্ণলীলার একটা ক্রম-বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কীর্তনীয়া সমাজ তাই গোবিন্দদাসের পদাবলীকেই বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং শ্রোতারাও বেশী আনন্দ পেতেন। এর কারণ যেমন তাঁর কবিত্ব, তেমনি তাঁর কাহিনীগত ধারাবাহিকতা।

কবিত্বের বিচারে কারুর মতে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ। আবার কেউ বলেন, গোবিন্দদাস পণ্ডিত, কিন্তু নিরাভরণভাবে প্রাণের কথা বলতে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের তিনি সমকক্ষ নন। তাই পণ্ডিত সমালোচকের মতে —"তাঁহার পদের রসাস্বাদন করিতে হইলে শুধু সহজ রসবোধ থাকিলেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ মনও প্রয়োজন।…গোবিন্দদাস বিচিত্র ভাবৈশ্বর্য, রূপকল্প ও রাধাকৃষ্ণ চরিত্র উপস্থাপনে বিশিষ্ট প্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে….সূক্ষ্ম ভাবের ব্যঞ্জনা আবেগানুসারে যে কী পরিমাণে চিত্র-সঙ্গীতময় হইতে পারে, তাহার অসংখ্য নিদর্শন গোবিন্দদাসের পদাবলীর সর্বত্র ছড়াইয়া আছে।"

৫

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে……

পদকর্তা গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গের রাধাভাবে ভাবিত রূপ বর্ণনা করেছেন। গৌরাঙ্গ চলেছেন গঙ্গার তীর ধরে নৃত্যরত অবস্থায় ভাবোন্মত্ত হ'য়ে। গৌরাঙ্গের চোখ দুটি মেঘের ন্যায় এবং সেখান থেকে অবিরত জলধারা বর্ষিত হচ্ছে। জীবন্ত প্রেমভাবের প্রতিমূর্তি গৌরাঙ্গকে কবি পুষ্পতরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নৃত্যরত অবস্থায় গৌরাঙ্গের অঙ্গের ঘাম মধুর মত বিন্দু বিন্দু ঝরছে এবং তার ফলে নানা ভাবরূপ কদম্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে। গৌরাঙ্গের দেহে পুলকরূপ মুকুলের প্রকাশ ঘটেছে। পদকর্তা আবেগাপ্লুত হয়ে বলেছেন, কিশোর গৌরাঙ্গের নৃত্যরত অবস্থায় কি অপরূপ রূপ-ই না দেখলাম! কারণ,—অশ্রু, পুলক, স্বেদ ইত্যাদি নানা সাত্ত্বিক ভাব তাঁর অঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখে মনে হচ্ছে ভাগীরথীর তীর উজ্জ্বল করে যেন একটি স্বর্ণবৃক্ষ এগিয়ে চলেছে। তিনি গৌরবর্ণ

বলে তাঁকে সোনার গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর তিনি কল্পতরু, কেননা, তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তিনি তার সেই কামনাই পূর্ণ করেন—প্রেমরূপ অপার্থিব ফল বিতরণ করে। ভক্তরূপ ভ্রমরগণ তাঁর নৃত্যরত চরণতলে যেন ঝঙ্কার তুলেছে। অর্থাৎ ভ্রমর যেমন পদ্মের ওপর গুণ্ গুণ করে ঘোরে, তাঁর চরণপদ্মের ওপর ভক্তরা বিভোর হয়ে সেইভাবে গুঞ্জনরত, তাঁর জয়গানে। তাঁর প্রেমরূপ সুগন্ধে লুব্ধ হয়ে সুরাসুরগণ ছুটে আসছে তাঁর কাছে এবং দিবারাত্র বিভোর হয়ে রয়েছে। গৌরাঙ্গদেব প্রেমরূপ রত্নফল তাদের মধ্যে অবিরত বিতরণ করে নিখিল বিশ্বজনের মনোবাসনা পূর্ণ করছেন। সেই অতুলনীয় চরণস্পর্শ থেকে একমাত্র দীনহীন পদকর্তা গোবিন্দদাসই বঞ্চিত হয়ে রইলেন।

শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে গোবিন্দদাসের জন্ম বলে তিনি শ্রীচৈতন্যকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেননি বলেই হয়তো এই আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

গোবিন্দদাস—পূর্ববর্তী পদে আলোচনা করা হয়েছে।

হেদে রে নদীয়াবাসী কার........

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর নদীয়াবাসীর শোকের চিত্র এখানে বর্ণিত হয়েছে। পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষ নদীয়াবাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নদীয়ার অধিবাসীরা, তোমরা কার মুখের দিকে তাকিয়ে আর ভরসা পাবে? গৌরচন্দ্রকে হাত বাড়িয়ে আটকাও, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। গৌর সন্ন্যাসী হ'য়ে গৃহত্যাগ করলে কে আর তোমাদের প্রেমভরে কোলে টেনে নেবে—কাতর ব্যক্তিকে কে আর যেচে প্রেমভরে সান্ত্বনা দেবে! হায়! হৃদয়ে কী তীব্র শেল আঘাত করলো। কেননা নয়নের মণি গৌর নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলো। আর তো আমরা গৌরাঙ্গের কাছে যেতে পারবো না, তাঁর সঙ্গে বসে কীর্তনের আনন্দাস্বাদের সুযোগ আর তো পাব না। বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ করে ভক্তরা গৌরাঙ্গের বিরহে কাঁদছে। পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষ আক্ষেপ করে বলছেন, তিনি এমনই পাষাণ

যে এতো আঘাতেও বিদীর্ণ হননি। এই ঘটনার পরেও তিনি বেঁচে আছেন। বেদনাবিদ্ধ চিত্তের মর্মান্তিক হাহাকার পদটিতে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। গোবিন্দ ঘোষের আন্তরিকতা পদটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত।

গোবিন্দ ঘোষ—বাসুদেব ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলোচ্য পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষ। এঁরা তিন ভাই-ই চৈতন্যের অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন। তাঁদের কবিত্ব-শক্তি উল্লেখযোগ্য। এঁদের পিতার নাম বল্লভ ঘোষ। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের নাম ছড়িয়ে পড়লে এঁরা এখানে এসে চৈতন্যের পারিষদদলে যোগ দেন। গোবিন্দ তাঁর ভাইদের মতোই কীর্তন গানে পারদর্শী ছিলেন। চৈতন্যের নির্দেশে গোবিন্দ নীলাচলে থেকে যান। চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যহেতু চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনায় গোবিন্দের আন্তরিকতা, আবেগ ও নিষ্ঠা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ ঘোষের সমস্ত পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক। পদরচনায় তাঁর সারল্য ও সহজ কবিত্ব যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি চৈতন্যজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বর্ণনারও অন্য এক বিশেষ মূল্য আছে। আলোচ্য পদে গৌরাঙ্গের জন্য ব্যাকুলতা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলা

আমরা জানি, বৈষ্ণব সাহিত্যে পঞ্চরসের কবিতার মধ্যে মধুররসের পদের সংখ্যা সর্বাধিক। সে তুলনায় বাৎসল্যরসের পদের সংখ্যা অল্প। কিন্তু সেই পদগুলি আবেগের আন্তরিকতায়, মাতৃহৃদয়ের আকুলতায় যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি মর্মস্পর্শী। বাৎসল্য রসের পদ রচনা করে সমধিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন যাদবেন্দ্র, বলরামদাস।

ঈশ্বরকে পুত্ররূপে ভজনা করাও চলে। 'বালগোপাল'রূপে ঈশ্বরের ভজনা করেছেন অনেক ভক্ত। নন্দ-যশোদা এই বাৎসল্য রসের মাধ্যমে ঈশ্বরের ভজনা করেছেন। পণ্ডিত শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী বলেছেন—"ভগবান যোগমায়ার দ্বারা আপন স্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে সন্তানভাবে

লালন, পালন, প্রহার, তর্জন প্রভৃতি করিয়াছেন।" পুরাণে কথিত আছে, মা যশোদা গোপালকে দুষ্টুমির জন্য দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চাইলে বার বার ব্যর্থ হবার পর শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় শেষে বাঁধা দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বা বাল্যলীলার পদগুলিতে মাতৃহৃদয়ের আবেগ, সন্তানের প্রতি স্নেহধারা স্বতস্ফূর্তভাবে জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। গোপাল তার খেলার সঙ্গী শ্রীদাম, সুদাম ও ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে মিলিতভাবে গোষ্ঠে যেতে চাইলে মাতার উদ্বেগ, আকুলতা, নানা আশঙ্কা অত্যন্ত জীবন্ত তুলিকায় চিত্রিত। আমাদের ঘরের কথা যেন সমস্ত দেবত্বের মহিমাকে আচ্ছন্ন করে' জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে খেলার সাথীদের সখ্যরসও সমানভাবেই উজ্জ্বল হয়ে চিত্রিত।

৭

আমার শপতি লাগে……

পদকর্তা যাদবেন্দ্র এই বাৎসল্যরসের বিখ্যাত পদটিতে গোপালের গোষ্ঠ-গমনের পূর্বে মাতার নানা আকুলতা ও উদ্বেগের চিত্র নিপুণ তুলিকায় অঙ্কন করেছেন। যশোদা গোপালকে বলছেন, আমার মাথার দিব্যি রইল তুমি যেন কখনও ধেনুর আগে আগে যেও না, আমার প্রাণের প্রাণাধিক নীলমণি! একথা মনে রেখো আগে আগে গেলে যদি ধেনু গুঁতিয়ে দেয়—বড় আশঙ্কা হয় মনে! ধেনুগুলিকে কাছাকাছি রেখো এবং তোমার মোহন বাঁশী বাজিও—আমি যেন ঘরে বসে শুনতে পাই সে ধ্বনি। তাতে বুঝে নেবো তুমি কাছাকাছি আছ—দূরে গেলে তো আরও শঙ্কা, আরও ভয়। বলাই যাবে আগে আগে, অন্য শিশুরা থাকবে বামপাশে, শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতিরা থাকবে পেছনে। তুমি তাদের মাঝে থেকে যাবে—কখনও সঙ্গছাড়া হবে না, কারণ মাঠে নানা ধরনের শত্রুর ভয় আছে। খিদে পেলে চেয়ে খেয়ে নেবে আর রাস্তার দিকে ভালভাবে চেয়ে চলবে, কারণ পথে অতিশয় তৃণাঙ্কুর আছে। হে কানু! কারুর কথায় বাহাদুরী দেখাতে বড় গরুকে ধরতে যেও না—আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর। আমার বিশেষ অনুরোধ, বেশী রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি কোরো না, গাছের

ছায়ায় থেকো, সূর্যের তাপ যেন গায়ে না লাগে। পদকর্তা যাদবেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন এদের সঙ্গী হতে পারেন। তাই প্রার্থনা করছেন পদকর্তা, তাঁকে সঙ্গে রাখবার জন্য, তিনি পাদুকাদি হাতে রাখবেন, যাতে প্রয়োজন হ'লেই গোপালের রাঙা পায়ে তা যোগান দিতে পারেন।

যাদবেন্দ্র—ইনি একজন বৈষ্ণব পদকর্তা। বাৎসল্যরসের সহজ সরল প্রকাশ এঁর পদের প্রধান আকর্ষণ। এঁর সম্পর্কে বেশী তথ্য জানা যায় না।

৮

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনাইতে নীলমণি……

যশোদা দধি মন্থন করছিলেন। সেই শব্দ শুনে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে নীলমণি গোপনে এসে হাজির হলো। গোপালের চাঁদমুখ দেখে মাতা যশোমতীর হৃদয় সুখ ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি গোপালের চাঁদবদন চুম্বন করলেন। যশোমতী গোপালকে ক্ষীর ননীর লোভ দেখিয়ে তাঁর সামনে নাচতে বললেন। নবনী-লুব্ধ হরি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে নবনী চাইল। যশোদা ছোট্ট হাতটি ভর্তি করে ক্ষীর ননী দিলেন আর রাঙা অধর দিয়ে তা খেতে দেখে তা যেন অপূর্বতা পেলো। খেতে খেতে গোপাল নাচতে লাগলো এবং কটিতে তার কিঙ্কিণী বাজতে লাগলো। এই দৃশ্য দেখে মায়ের মন হর্ষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। নন্দদুলাল কি সুন্দর নাচ্ছে! তাই দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে মাতা যশোদা মন্থনদণ্ড ছেড়ে উদ্বেলিত হৃদয়ে হাততালি দিয়ে উঠ্লেন। গৃহকর্ম ভুলে মাতা সখী রোহিণীকে ডেকে গদ গদ ভাবে বলে ওঠেন, দেখ সখী! আমার গোপাল কি সুন্দর নাচছে। পদকর্তা ঘনরাম্ দাস বলছেন, এই দৃশ্য দেখে রোহিণীও আনন্দিত এবং দু'জনের চিত্তই বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্লো।

ঘনরাম দাস—একজন বৈষ্ণব পদকর্তা।

৯

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে……

পদকর্তা বলরাম দাসের বাৎসল্যরসের একটি উৎকৃষ্ট পদ। শ্রীকৃষ্ণ-যশোদার মান-অনুযোগ এতো অপূর্ব, সরল ও নিরাভরণ ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে, বর্ণনার গুণে তা পাঠকের চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। মাতা যশোদা কৃষ্ণকে 'ননীচোরা' বলায় অভিমানের তীব্রতায় গোপাল কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়। তাই পালকপিতা নন্দের সামনে এসে গোপাল অনুযোগ করে মাতা যশোদার বিরুদ্ধে। আমি আর এখানে থাক্‌বো না, মা হয়ে আমাকে বলে কিনা 'ননীচোরা'। মাতা যশোদা গোপনে ননী খাবার অপরাধে গোপালের হাত দু'টো ধরে ছাঁদন দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন দেখে গোয়ালিনীরা সকলেই হাস্‌তে লাগলো এবং ঘটনা কি হয় দেখবার আনন্দে চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। বাৎসল্যরসে সকলের মন ভরপুর। গোপাল বলছেন, ননী খেয়েছে বলাই অথচ মা যশোদা ভাল করে খোঁজ না নিয়েই মিথ্যা তার নামে অপবাদ দিচ্ছেন। অন্য ছেলেরা ননী খেলে যত দোষ হয় গোপালের। তাদের মায়েরা কি ছেলেদের এভাবে বেঁধে রাখে? এই দুঃখ অপবাদ সহ্য করে' আমি আর তোমার এখানে থাক্‌বো না—আমাকে যতই বল না কেন? আমি পরের ছেলে তো! তোমার পেটের ছেলে নই তো, তাই শিশু বলে কোনও দয়াবোধ নেই। সেজন্য এভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছ। তাই তাঁদের দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে ফেরত দিয়ে এ দুঃখে সে আজ যমুনার পরপারে চলে যাবে। পদকর্তা বলরাম দাস, মাতা যশোদাকে সম্বোধন করে' বলেছেন, গোপালের প্রতি এ ধরনের আচরণ করা সঙ্গত হয়নি। এখনই কাছে গিয়ে গোপালকে কোলে তুলে আদর করা উচিত। পদকর্তার অনুরোধে যেন কাজ হলো। মাতা যশোদা গোপালের কাছে এসে আদর করে' গোপালের মুখ মুছিয়ে দিলেন এবং তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এইভাবে পদটির মধ্যে বাৎসল্যরসের অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভক্ত-ভগবান যেন একসূত্রে বাঁধা পড়লো।

বলরাম দাস—চণ্ডীদাসের মতো একাধিক বলরাম দাসের সন্ধান পাওয়া গেছে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে। তবে মনে হয় আলোচ্য পদের পদকর্তা বলরাম দাস কৃষ্ণনগরের দোগাছিয়া গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দের সেবক। তাই মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে তাঁর জন্ম হয়। সে হিসাবে চৈতন্যলীলার সময়ে তিনি নিতান্তই বালক ছিলেন। কবি পদরচনাকালে চৈতন্যলীলার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতেরও বন্দনা করেছেন।

বাংলা ও ব্রজবুলিতে তিনি গৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও বলরাম দাসের কবিত্বের বিশেষ করে শব্দ চয়নের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছেন। বলরাম দাসের পদাবলীর ভাষা সহজ ও লৌকিক ছন্দের দোলায় শ্রুতিমধুর। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের মতো তাঁর ভাষায় অলঙ্কারের ঐশ্বর্য নেই বটে, তবে চণ্ডীদাসের মত সহজ সরল আবেগ প্রকাশে ও ধ্বনিমাধুর্যে তাঁর পদে ভাবের গভীরতা ও আন্তরিকতা সম্যকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। সখ্য ও বাৎসল্যরসের পদ রচনায় বলরামের কৃতিত্ব পদাবলী সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অপূর্ব চিত্রাঙ্কন রচনাতেও তাঁর নৈপুণ্য কম নয়। কবির কাছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই যে উভয়ের কতো আপন, তা কবির পদগুলিতে চিত্রিত হয়েছে।

বলরাম দাসের পদাবলীতে গভীর আধ্যাত্মিকতাও প্রকাশ পেয়েছে। যে পদটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলো, তাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই উভয়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল।

> হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
> তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥

বলরাম দাস কৃষ্ণের বারমাস্যা রচনা করেছেন। রাধাকে বৃন্দাবনে রেখে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন, কিন্তু রাধার কথা তিনি ভুলতে পারছেন না। বিভিন্ন

ঋতুর আগমনে প্রকৃতির অঙ্গে নানা সৌন্দর্যের আবির্ভাব দেখে তাঁর চিত্তে রাধার সঙ্গে মিলনের নানা স্মৃতি জেগে উঠেছে। পদকর্তা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি মেনে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মিলন, অভিসার, রসোদ্গার, বাসকসজ্জা, বিরহ প্রভৃতি নানা পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন।

১০

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে……

মাতা যশোদা বালক গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাবার আগে নানা দুশ্চিন্তায় গোপালের সঙ্গী-সাথীদের ডেকে অনুরোধ করেছেন, গোপালের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবার জন্য। যশোদার এই উদ্বেগ দেখে পদকর্তা বলরাম দাস এখানে গোপালের সঙ্গী হিসেবে যেন মাতাকে আশ্বস্ত করছেন। তাই পদটি মূলত সখ্যভাবের, কিন্তু বাৎসল্যরসের প্রকাশ-ও এখানে লক্ষ্য করা যায়।

বালক কৃষ্ণ ধেনু চরাতে যাবেন, কারণ গোপজাতির গো-পালনই পেশা। এটা স্বাভাবিক ঘটনা হ'লেও মা যশোদার মন যেন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। মায়ের প্রাণে নানা শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই তিনি শ্রীদাম, সুদাম ও বলরাম প্রভৃতি সঙ্গী-সাথীদের ডেকে অনুরোধ করছেন, তারা যেন গোপালের প্রতি বিশেষ নজর রাখে। তারা যেন গোপালকে নিয়ে বেশী দূরে না যায়। অতিদূর বনে, কুশাঙ্কুর আচ্ছাদিত পথে যেন গোপালকে নিয়ে তারা না যায়। সামনে পেছনে সখাদের রেখে তার মাঝে গোপাল যেন আস্তে আস্তে যায়—অত তাড়া করার কি আছে? নব তৃণাঙ্কুরে গোপালের পা দুখানি যেন ক্ষত-বিক্ষত না হয়। গোপালকে মাতা যশোদার বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন শিঙাতে 'মা মা' ধ্বনি তোলেন, যাতে তিনি ঘরে বসে তা শুনে নিশ্চিত হ'তে পারেন। কপালের দোষে ঈশ্বর তাঁদের গোপজাতি করে পাঠিয়েছেন, গোপালন তো করতেই হবে। তা না হ'লে এই শিশুকে তিনি কখনই বনে পাঠাতেন না—গোচারণের জন্য। কিন্তু পদকর্তা বলরাম দাস মাতা যশোদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, নন্দরাণী মা যশোদা

যেন চিন্তা ও ভয় না করেন গোপালের জন্য। তাঁরা সঙ্গে থাকবেন এবং গোপালকে পাদুকা যোগাবেন। ফলে তাঁর পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হবার ভয় থাকবে না। পদকর্তা মাতা যশোদার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন একথার অন্যথা হবে না।

বলরাম দাস—পূর্ববর্তী পদের শেষে আলোচনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা

১১

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ……

শ্রীকৃষ্ণের মাথায় উঁচু করে' কে খোঁপা বেঁধে দিয়ে তাতে ময়ূরপুচ্ছ দিয়েছে! এ সাজ তো নারী মনোহরণকারী। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপুচ্ছের বিস্তার দেখে মনে হয় যেন আকাশের নবমেঘে ইন্দ্রধনুর শোভা প্রকাশ পাচ্ছে। বেল ফুল ও চামেলী ফুলের মালা গেঁথে কে মোহন চূড়াটি বেষ্টন করে সাজিয়ে দিল? দেখে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার স্রোতধারা নীলগিরি পর্বত থেকে নেমে বয়ে চলেছে। (প্রচলিত ধারণা ছিল হিমগিরি থেকে গঙ্গা বয়ে চলেছে)। শ্রীকৃষ্ণের কপালে চন্দনের ফোঁটা ঝিকমিক করছে, মনে হয় যেন চাঁদ প্রশস্ত কপালরূপ আকাশে প্রকাশমান। তার ওপর আবার কে ফাগের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে? দেখে মনে হয় যেন কেউ রৌপ্য আধারে জবাফুল দিয়ে যমুনার পূজার জন্য যমুনার কালো জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের কালো অঙ্গে কে রক্তবর্ণ হিঙ্গুল গুলে যেন লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে যেন রক্তকবরীকে কালো যমুনা পূজা করছে। পদকর্তা জ্ঞানদাসের এই অপরূপ রূপ দেখে মনে হচ্ছে, শ্যামরূপের পরিপূর্ণ শোভা যেন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। এ দৃশ্য তো এক নজরে দেখে নেবার বস্তু নয়। এই বিচিত্র শ্যামরূপ ধীরে ধীরে আস্বাদ করতে হয়।

জ্ঞানদাস—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"একদা হয়তো বৈষ্ণব

পদের ধর্মীয় মূল্যই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এ যুগের পাঠকের মনে মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যও যে রসের দোলা দেয়, তাহার কারণ—ইহার মধ্যে যুগাতিচারী অনুভূতি লুকাইয়া আছে। ...জ্ঞানদাস যেন তাঁহারই কালের কবি, তাঁহার অন্তরের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে কবি জ্ঞানদাসের যেন জন্মান্তরীণ যোগাযোগ।"

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। নিত্যানন্দের অন্যতমা পত্নী জাহ্নবা দেবীর কাছে তিনি মন্ত্র নেন এবং নিত্যানন্দের ভক্তমণ্ডলীতে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদাসের জীবনকাহিনীর উপাদান এতো অল্প জানা যায় যে জনশ্রুতিই তাঁর সম্পর্কে জানার প্রধান অবলম্বন। কেউ বলেন, তিনি চিরকুমার ছিলেন। আবার কারুর মতে, তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁর একটি পুত্র ছিল। অসিতবাবু বলেছেন —"কাঁদড়ায় এখনও জ্ঞানদাসের মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ পূজিত হন।" জ্ঞানদাসের জন্মসন নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা অনুমান লক্ষ্য করা যায়। খেতুরী উৎসবে জ্ঞানদাস যোগদান করেন। নানা হিসাবপত্র করে' এটুকু অন্ততঃ বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে জ্ঞানদাসের জন্ম হওয়া সম্ভব। অন্য প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের মতো জ্ঞানদাস ভণিতাযুক্ত একাধিক কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। ব্রজবুলিতে পদ রচনা সে সময়ে একটা প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। জ্ঞানদাস বাংলার সঙ্গে ব্রজবুলি মিশিয়ে ফেলেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে। কেননা "প্রথার খাতিরে ব্রজবুলিতে পদরচনা করিলেও তাঁহার মনের কথাটি কিন্তু বাংলা পদেই যথার্থ ধরা পড়িয়াছে। ...তাঁহার ব্রজবুলিতে বুদ্ধির কৌশল, আবেগ, আন্তরিক কলানৈপুণ্য—সবই আছে। ....কিন্তু কবি যেন এই জাতীয় পদে বেশ সুস্থ হইয়া নিজেকে পুরাপুরি সঁপিয়া দিতে পারেন নাই। ...যে সমস্ত বিচিত্র বাক্‌রীতি জ্ঞানদাসের নিজস্ব সম্পদ, যাহা তাঁহাকে আধুনিক পাঠকের দুয়ারেও

শ্রদ্ধান্বিত আসন দিয়াছে, তাহা এই ব্রজবুলির পদে ততটা পাওয়া যায় না—যতটা পাওয়া যায় তাঁহার বাংলা পদে।"

জ্ঞানদাসের সমস্ত পদই যে শিল্পনৈপুণ্যে অনবদ্য, একথা মানতেই হবে। কিছু পদে যেমন স্বতস্ফূর্ত ভাব ও আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, অন্য কিছু পদে আবার কৃত্রিমতা লক্ষণীয়। কিন্তু যখন জ্ঞানদাস ব্রজবুলির কৃত্রিম আচরণ ত্যাগ করে বাংলা পদ রচনায় ব্রতী হয়েছেন এবং সহজ কথায় ভাবকে সোজাসুজি প্রকাশ করেছেন, সেখানেই তিনি যথার্থ চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্যরূপে চিহ্নিত। অনেক পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ লিখেছেন, জ্ঞানদাস লিখেছেন শ্রীরাধার বাল্যলীলা। এছাড়া জ্ঞানদাসের দানখণ্ডের কয়েকটি পদ, নৌকাবিলাসের পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাছাড়া জ্ঞানদাসের রসোদ্গারের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আছে। আক্ষেপানুরাগ পদে আবেগের স্বাভাবিকতায় আজও তা সমান আকর্ষণীয়। সমালোচক পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, জ্ঞানদাসের যুগের সঙ্গে আমাদের যুগের ব্যবধান চারশো বছর হলেও জ্ঞানদাসের পদে আমরা আধুনিক মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। "রাধাকৃষ্ণের রূপকে কবি যেন নিখিল মানবের দেশকালাতীত বেদনাকেই নিকষে সোনার রেখার মতো ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আবেগে তিনি মানবিক, চিত্রকল্পে তিনি আধুনিক।"

১২

মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ········

সুন্দরী রাধা চলেছেন। পদকর্তা জগদানন্দ সেই রূপবর্ণনায় নিজেই মুগ্ধ। রাধার সৌন্দর্য যেন বিকশিত পুষ্পস্তবককে হার মানায়; তাঁর নূপুর-গুঞ্জন মধুকরের গুঞ্জনের চেয়ে শ্রুতিসুখকর; তাঁর গমনভঙ্গী যেন হস্তীর গমনভঙ্গীকে হার মানায়। শ্রীরাধার কেশদাম কালো মেঘের চেয়েও সুন্দর, তার কৃষ্ণত্ব মেঘের কৃষ্ণত্বকে ম্লান করে দেয়। তাতে শোভা পাচ্ছে চামেলী ফুলের মালা। কাজল যুক্ত পদ্মপলাশ চোখ দু'টির চঞ্চলতা যেন খঞ্জন পাখীর গতিভঙ্গিকেও হার

মানায়। তাঁর সুন্দর দেহ সোনার মতোই উজ্জ্বল এবং সেই যৌবনবতীর দেহ-লতায় যেন কামদেবের প্রকাশ কামনার উদ্রেক করছে। তাঁর করপদ্মে কঙ্কণ ও চরণে কিঙ্কিণীর মৃদু ঝঙ্কার চিত্তকে মুগ্ধ করছে। কালীয় নামক ভয়ঙ্কর বিষধর সাপকে যিনি দমন করেছিলেন, সেই ভুজঙ্গদমন শ্রীকৃষ্ণকেও দমন করতে পারে এমনই প্রকাশ শ্রীরাধার কটাক্ষপূর্ণ নয়নের ভ্রূযুগলের নৃত্য, যেন কৃষ্ণকে কাছে পেলেই দংশন করবে।

তাঁর সঙ্গিনীরা যেন রঙ্গ করবার জন্য সকলে নীল রঙীন শাড়ী পরিধান করেছে। রাধার দাঁতের শোভা কুন্দকুসুমকেও যেন নিন্দা করছে। তাঁর মুখমণ্ডল যেন শরতের শশীকেও জয় করেছে। প্রেমরূপ সিন্ধু অতিক্রম করতে গিয়ে শ্রীরাধার পথশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। স্বর্গের নারীরা রাধার নন্দন সুখকর হাসির আনন্দ দেখে যেন ধাঁধায় পড়েছে। তাঁর নখের শোভায় যেন মণি-মাণিক্য বিরাজিত। তাঁর নামে যেন স্বর্ণনূপুর মধুর স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে। পদকর্তা জগদানন্দ বলছেন যে, শ্রীরাধার চরণপদ্মের সৌন্দর্য যেন জলের পরিবর্তে স্থলেই শোভা পাচ্ছে। তাতেই তিনি মুগ্ধ।

জগদানন্দ—জগদানন্দ প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু জগদানন্দ বাস করেন বীরভূমের জোফলাই গ্রামে। প্রায় সব বৈষ্ণব কবিদের মতো জগদানন্দ নামে একাধিক কবি ছিলেন। একজন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অন্যজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুরের পিতার নামও জগদানন্দ ঠাকুর।

চৈতন্যবিষয়ক তাঁর কয়েকটি পদ বেশ উল্লেখযোগ্য। সরলভাবে অথচ অনুপ্রাসের ঝঙ্কার তুলে চিত্তাকর্ষক বাগ্‌চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে তিনি এক শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হন। কিন্তু গোবিন্দদাসের শব্দঝঙ্কারের সে লালিত্য এই কবির রচনায় অনুপস্থিত। অসিতবাবু তাঁর গ্রন্থে জগদানন্দের আর এক শ্রেণীর পদের আলোচনা করেছেন। এই জাতীয় পদে লম্বালম্বি পড়ে

গেলে একরকম অর্থ হয়, এবং আড়ের দিকে প্রতিশব্দের আদ্যক্ষর ধরলে এর আকার ও অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। এই ধরনের শব্দের খেলায় শব্দজ্ঞানের পরিচয় থাকলেও কবিত্বশক্তির পরিচয় নেই।

প্রার্থনা

আমরা ভূমিকায় বলেছি, ঈশ্বর যেখানে ঐশ্বর্যময়, যেখানে তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, সেখানে ভক্ত দীনভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে। অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা, যথার্থ অনুতাপে দগ্ধ হয়ে মানুষ নবজন্ম লাভ করে। তার থেকেই সাধকের অন্তরে জাগে দৈন্য এবং আর্তি। প্রাক্-চৈতন্য যুগের প্রার্থনা-বিষয়ক পদের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের প্রার্থনা-বিষয়ক পদের ভাবগত পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। প্রাক্-চৈতন্য পদকর্তার (যেমন বিদ্যাপতি) পদগুলিতে আন্তরিকতা, আবেগ, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পরম নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে, আত্মঅনুশোচনার অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার মানসিকতাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাদের রচনায় সে ঐকান্তিক আকুলতা ও আত্মসমর্পণের নির্ভরতা প্রকাশ পায়নি। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদকর্তারা বিদ্যাপতির মতো মুক্তি চাননি, চেয়েছেন 'যুগল-সেবন'। সেবার আকুলতা যতখানি এইসব পদে প্রকাশ পেয়েছে, ঈশ্বরের সর্বশক্তিময়তা, তাঁর ঐশ্বর্যের মহিমা ততখানি প্রকাশ পায়নি।

শ্রীচৈতন্যের মতে, 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা।' তাই "ভক্ত যেখানে ভগবানের ঐশ্বর্যলীলার কথা চিন্তা করেন, সেখানে ভগবানের সহিত তাঁহার একটা বিরাট ব্যবধান রচিত হয়। কিন্তু রসের সাধনায় তিনি 'মধুর হৈতে সুমধুর'।" তাই বিদ্যাপতি প্রভৃতি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে ঐশ্বর্যলীলার যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্ভ্রমের দূরত্ব রচিত হয়েছে, চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের বর্ণনায় মহাপ্রভুর প্রভাবে প্রণয়ের নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে, সেখানে মাধুর্যলীলাই প্রকট।

১৩

তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম……

পদকর্তা বিদ্যাপতি এই পদে ঈশ্বরের কাছে আত্মস্বীকারোক্তি দ্বারা নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে' ঈশ্বরের শরণ নিয়েছেন, ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁকে আশ্রয় করেছেন। কবি বর্ণনা করছেন, সমুদ্র-তীরবর্তী উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর জল পড়লে যেমন নিমেষেই তা শুষে নেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পরিবৃত এই সংসারে মনটাকে তেমনি শুষে নিয়েছে। আমি এমনই নির্বোধ যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হ'য়ে এই সংসারের মধ্যেই নিজেকে মাতিয়ে রেখেছিলাম। এখন এই পরিণত বয়সে আমি কোনও কাজেই লাগবো না। হে জগতের পিতা! আমার পরিণাম যে ভয়াবহ, তাতো বুঝতেই পারছি। আমার জীবন ব্যর্থ হল, এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে মজে থেকে। তবে ভরসা এই যে তুমি জগতের ত্রাণকর্তা, তুমি দীনবন্ধু, সেই বিশ্বাসে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। নিজ জীবন পর্যালোচনা করে' কবি বলছেন, জীবনের অর্ধেক সময়তো ঘুমিয়ে কাটলো, শৈশব ও বার্ধক্যের ভারে কিছুকাল কাটলো। যৌবন কাটলো প্রমোদ উদ্যানে নারীর সঙ্গে শৃঙ্গাররস আস্বাদনে। ফলে তোমাকে ভজনা করবার অবকাশ পেলাম না। চতুর্মুখ ব্রহ্মা—যিনি যুগযুগ ব্যাপী পরমায়ু ধারণ করেন, তিনিও যুগযুগ ব্যাপী সাধনায় তোমার আদি এবং অন্ত খুঁজে পেলেন না। অর্থাৎ তোমার আদিও নেই, অন্তও নেই। তুমি অনন্ত, অসীম। তোমার মধ্যেই সৃষ্টি, তোমার মধ্যেই লয় হয়, যেমন সাগরের ঢেউগুলির শুরু ও শেষ নেই, তা চিরপ্রবহমানা। পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন, হে জগন্নাথ! তুমি এখন একমাত্র অগতির গতি। তাই মৃত্যুভয়ে ভীত আমার চিত্ত তোমাকেই আশ্রয় করতে চায়। কারণ তুমি আদি এবং অনাদির নাম বলে' লোকে বিশ্বাস করে। তাই পৃথিবীকে ত্রাণ করবার ও রক্ষা করবার ভার তোমাকেই নিতে হবে।

এই পদটিতে কবি আত্মসমীক্ষা করেছেন। যৌবনে তিনি ছিলেন লৌকিক

শৃঙ্গার রসের কবি। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐশ্বর্যভাবসম্বলিত কৃষ্ণভক্তির কবিরূপে প্রকাশিত হন।

বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি সম্পর্কে আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি। সে আলোচনা কবিত্ব ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে। বিদ্যাপতি দ্বারভাঙা জেলার বিসফী গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি। তাঁদের কৌলিক উপাধি 'ঠকুর' যা আমাদের বাঙলায় 'ঠাকুর'-এ রূপান্তরলাভ করেছে। বিদ্যাপতির প্রপিতামহ বীরেশ্বর প্রথম এই বংশে মিথিলার রাজকর্মচারীরূপে যোগদান না করে' শাস্ত্রচর্চা ও যজনযাজনে জীবন কাটান। বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত পিতার মতই জীবনযাপন করেন। অবশ্য পিতা গণপতির সে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। তবে বিদ্যাপতি এই উচ্চবংশজাত বলে' অর্থকৌলীন্য না থাকলেও মিথিলা রাজবংশের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। অসিতবাবুর মতে, "মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত মিথিলার সমাজজীবনকে তাঁহারা স্মৃতি সংহিতার বিধানের দ্বারা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। স্মার্তসংস্কার এই বংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং বিদ্যাপতিও একাধিক প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।"

মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম জড়িত। বিদ্যাপতি এই বংশের রাজা কীর্তিসিংহের কাহিনী বর্ণনা করে' রচনা করেন 'কীর্তিলতা'। এই সময়ে তাঁর বয়স অল্প ছিল বলে তিনি নিজেকে এখানে বালক কবি বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর রাজসিংহাসনের উত্থান-পতনের সঙ্গে বিদ্যাপতিরও ভাগ্যের উত্থান-পতন ঘটে। এই বংশের বিভিন্ন রাজা ও রাণীর নির্দেশে তিনি গ্রন্থাদি রচনাও করেন। যেমন—শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী, ভূপরিক্রমা, কীর্তি-পতাকা, পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী ইত্যাদি।

আমরা জানি, বিদ্যাপতির জন্ম পণ্ডিত ব্রাহ্মণবংশে হয়েছিল। তার ফলে রাজকার্য ও পাণ্ডিত্য এই বংশের ধারায় বহমান ছিল। এর ফলে নাগরিক জীবনের সঙ্গে বিদ্যাপতির পরিচয় বাল্যকাল থেকেই। তাঁর কাব্যরচনায় যে

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও নির্মিতিকৌশল লক্ষ্য করা যায়, তা এই রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তাই একদিকে রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ, অন্যদিকে স্মার্ত পণ্ডিত হিসেবে মিথিলার সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও চালিত করা—এই উভয় দিকেই বিদ্যাপতির কর্মধারা প্রবাহিত। তাই বিদ্যাপতি কবি এবং স্মার্ত পণ্ডিত হিসেবে সে সময়ে মিথিলায় বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। প্রচলিত গল্প অনুসারে বিদ্যাপতির দুই বিবাহ এবং তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। বিদ্যাপতির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কবি নিজে নীরব ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না বলে নানা গল্পে তাঁর জীবন পল্লবিত।

আমরা জেনেছি, বিদ্যাপতি নাগরিক মনোভাবাপন্ন রাজসভার কবি ছিলেন বলে রাজসভার বিত্তবান রসিকজনের মনোরঞ্জনের উপযোগী পদ রচনা করে' শৃঙ্গাররসের রসিক কবি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু রাজসভার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। ফলে মুসলমান আক্রমণে সাংস্কৃতিক জীবনে যে আঘাত এলো, সমাজ-জীবনে ও চিন্তাজগতে যে আলোড়ন দেখা দিল, সেই তরঙ্গবিক্ষেপের প্রকাশ বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষ করেন ও তাঁর পূর্বপুরুষদের জীবনে সে আঘাত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেজন্য অসিতবাবুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত জীবনে রাজ্যসঙ্কট, রাজসভা ও রাজবংশ নিশ্চয় একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার মার্জিত ছন্দ, রুচির নাগরিকতা, আদিরসের বাহুল্য ইত্যাদি প্রধানতঃ দরবারী আদর্শে পরিচালিত। অপরদিকে 'কীর্তিলতা' হইতে তাঁহার ইতিহাসানুগামী কালচেতনারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।······সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিদ্যাপতি প্রথম পরিবেশ-সচেতন কবি।" তাই বিদ্যাপতি একাধারে সমাজসচেতন, নাগরিক মানসিকতা-সম্পন্ন ও সর্বোপরি পদাবলী সাহিত্যের যুগোত্তীর্ণ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একথা মানতেই হবে যে, শেষোক্ত কারণের জন্যই বিদ্যাপতি আজও

আলোচ্য বিষয় ও জনপ্রিয় বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৪

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়……

পদকর্তা বিদ্যাপতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রার্থনা বিষয়ক পদ। এখানেও কবি জগৎপিতার কাছে প্রার্থনা করে আত্মনিবেদন করছেন পরম নির্ভরতায়। হে মাধব, আমি তিলতুলসী দিয়ে আমার এই দেহ তোমাকেই সমর্পণ করলাম। তোমাকে অনেক মিনতি করে' বলছি, আমাকে দয়া করে প্রত্যাখ্যান কোরো না। আমার মধ্যে গুণের লেশ মাত্র নেই, তাই দোষগুণের বিচার করে' আমাকে গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। কিন্তু তুমি তো জগতের নাথ, আর আমিও তো জগতের বাইরের কেউ নই। সুতরাং আমাকে তুমি ত্যাগ করবে কি করে? আমি প্রার্থনা করি, মানুষ, পশু, পাখী, কীটপতঙ্গ—জন্ম জন্মান্তরে কর্মফলের জন্য যেরূপেই আমার জন্ম হোক না কেন, তোমার প্রতি আমার মন যেন অটুট থাকে। পদকর্তা বিদ্যাপতির কাতর প্রার্থনা, হে দীনবন্ধু! এই সংসারসমুদ্র পার হ'তে একমাত্র তোমার চরণপদ্মই ভরসা। সেই চরণের একপ্রান্তে এক তিল ঠাঁই দিও, তাতেই আমি তরে যাব; এই ভবসমুদ্র পার হতে পারবো।

বিদ্যাপতি—পূর্ববর্তী পদের শেষে আলোচনা আছে।

১৫

হরি হরি আর কবে এমন দশা হবে……

পদকর্তা নরোত্তম দাসের একটি উল্লেখ্য প্রার্থনা বিষয়ক পদ। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ এবং শ্রীরাধা পরমাপ্রকৃতি। বৈষ্ণব ভক্ত প্রার্থনা করে এই পরমাপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে। ভক্ত বৈষ্ণব পুরুষের অভিমান ত্যাগ করে' পরম প্রকৃতিকে লাভ করতে চায়। শ্রীরাধা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা, তবে জীবেরা তাঁর সখিদের মতো হবে। এই কথাই এখানে পদকর্তা বর্ণনা করেছেন।

পদকর্তা বলছেন, হে শ্রীহরি! আমার এমন দশা কবে হবে, যেদিন সখীভাবে রাধা-কৃষ্ণের সেবার জন্য পুরুষদেহ ত্যাগ করে' নারী হব। তোমাদের দু'জনকে নূপুর পরাব অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ঘটাব। তোমার মাথার চূড়াটি টেনে বেঁধে দেব এবং কুঁচফুলের দ্বারা মালা গেঁথে তাই দিয়ে তোমার চূড়াটি বেষ্টন করে দেব। নানা ফুলের সহায়তায় মালা গেঁথে পরিয়ে দেব। সখার সঙ্গে তোমার অঙ্গেও পীতাম্বর বস্ত্র পরাব, বদনে তাম্বূল দেব। নীলাম্বরে সাজিয়ে দিয়ে সেই অপরূপ কৃষ্ণ-রাধার যুগলমূর্তি নয়নভরে নিরীক্ষণ করবো। রাধাকে শুধু তো নীলাম্বরে সাজাব না, রতনের জরি দিয়ে বিচিত্রভাবে তার বেণী বেঁধে দেব। তাতে আবার গেঁথে দেব মালতীফুলের গুচ্ছ।

পদকর্তার মনের গভীর ইচ্ছা, এই রূপমাধুরী নয়নভরে দেখা। রূপ-সনাতনের কাছে পদকর্তা নরোত্তম দাস এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন, যেন তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়—এইটুকুই সম্পদ তিনি যেন পান।

নরোত্তম দাস—শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে যে ক'জন ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করে সার্থকতা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, নরহরি সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজে মহাপ্রভুর অভাববশত যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাতে বৈষ্ণবধর্ম-সাধনার বেগ যেন মন্দীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের স্তব্ধপ্রায় প্রবাহে নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করলেন যে কজন ভক্ত মহাজন তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের চরিত্রের মহিমায় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হন। এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবধর্মে নতুন ভাবপ্রবাহ ও গতি সঞ্চারিত হ'ল।

নরোত্তম দাস বৈষ্ণব সমাজে বুদ্ধদেবের অবতার বলে পরিগণিত। গঙ্গা তীরবর্তী খেতুর নামক গ্রামে নরোত্তম দাসের জন্ম হয় আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। তাঁর পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত রাজশাহী জেলার গোপালপুরের জমিদার ছিলেন। কিন্তু এই ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ

করলেও তিনি ছেলেবেলা থেকেই বুদ্ধদেবের মতো ভোগবিলাসে বীতস্পৃহ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানে যখন সমগ্র বাঙলাদেশ শোকমগ্ন, তাঁর অলৌকিক জীবনকথা মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছিল, বালক নরোত্তম সেসব কথা শুনে শ্রীচৈতন্যর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর বাবা ছেলের এই বৈরাগ্যভাব লক্ষ্য করে' তাঁর মনোভাব পাল্টাবার জন্য তাঁকে গৌড়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু নরোত্তম একাকী বৃন্দাবনে চলে যান এবং বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি জীবগোস্বামীর কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর সতীর্থ ছিলেন শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ। নরোত্তম স্বগ্রামে ফিরলেও সংসারী না হ'য়ে খেতুরী গ্রামে একটি কুঠির বেঁধে ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্যপুত্রের সহায়তায় খেতুরীতে বিশাল মন্দির নির্মাণ করান। এখানে যে বৈষ্ণব উৎসব পালিত হয়, তাই বিখ্যাত 'খেতুরী মহোৎসব' নামে খ্যাত। নরোত্তমের দ্বারাই পালাকীর্তন প্রথা গৌরচন্দ্রিকা গানের সূত্রপাত হয়। তিনি অন্যান্য বিখ্যাত পদকর্তাদের সঙ্গে নিজেও উল্লেখযোগ্য গৌরচন্দ্রিকা পদ রচনা করেন। তাঁর পদগুলি সত্যকার ভক্তিভাব এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। তাঁর প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলিও উল্লেখযোগ্য।

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

আমরা জেনেছি, মিলনের পূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বংশীধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা যে রতি উৎপন্ন হয় এবং যা নায়ক-নায়িকার হৃদয়কে বিকশিত করে তাকে পূর্বরাগ বলে। পদাবলী সাহিত্যে রাধার পূর্বরাগের পদের সংখ্যাই বেশী, তবে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদও সংখ্যায় কম নয়। পূর্বরাগের দশ দশা—লালসা, উদ্বেগ, নিদ্রাহীনতা, অঙ্গের কৃশতা, জড়িমা, অসহিষ্ণুতা, দেহের পাণ্ডুতা, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু। পূর্বরাগ থেকেই প্রথমে আসে রূপের প্রতি অনুরাগ। এই বর্ণনায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিত্ব

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে পূর্বরাগের গভীর ভাব-ব্যঞ্জক পদগুলি রচনায় সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস।

রাধার পূর্বরাগের পদগুলিতে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদে নিছক রাধার দেহলাবণ্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশিত। বিদ্যাপতি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের পূর্বরাগের পদই রচনা করেছেন। ত্রিপুরাবাবুর মতে, "বিদ্যাপতির রাধা কমলিনীর মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধাকে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যোগিনীর বেশে।" বৈষ্ণব সাহিত্যে এই চারজন কবির অনেক উৎকৃষ্ট পূর্বরাগের পদ পাওয়া যায়, যা চিরন্তন সাহিত্যরসের আস্বাদ এনে দেয়। "প্রেম যখন ক্ষণে ক্ষণে নবীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বলে **অনুরাগ**। শ্রীভগবান যেমন নবনব রূপে ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন, ভগবানের প্রতি ভক্তের রতিও তেমনই 'তিলে তিলে নূতন হোয়'।"

১৬

অবনত আনন কএ হম রহলিহু……

পদকর্তা বিদ্যাপতির একটি উল্লেখযোগ্য পদ। রাধা বলছেন, আমার চোখ দুটি পাছে চুরি করে' শ্রীকৃষ্ণ মুখসৌন্দর্য দেখে ফেলে, সেজন্য আমি মুখ নীচু করে রইলাম। কিন্তু চোখ দুটি সে বাধা মানলো না। সে চুরি করে' দেখে নিল। চকোর যেমন চাঁদের সুধা পান করবার জন্য ছুটে যায়, আমার চোখ দুটিও সেইরকম প্রিয়তমের মুখসুধা পান করবার জন্য ধেয়ে গেল। তখন জোর করে চোখ দুটিকে নিজের চরণে স্থাপিত করলাম। কিন্তু মধুপান করে' মত্ত ভ্রমর যেমন উড়তে পারে না, তবুও পাখা ছটফট্ করে, তেমনি আমার রূপমুগ্ধ চোখ তাকাবার (ওড়বার) শক্তি হারিয়ে পাখা ছট্‌ফট্ করতে ছাড়লো না অর্থাৎ দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারলো না। মাধব মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, তা না-শোনার জন্য আমি কান ঢাকলাম। কিন্তু কান ঢাকতে যেটুকু দেরি হয়েছে,

সেই অবসরে শ্রবণপথ দিয়ে মদন পঞ্চবান ধনু ধরে আমার প্রতি বিরূপ হলো অর্থাৎ আমাকে কাতর করে তুললো। দেহের ঘামে অঙ্গরাগ গেলো ভেসে। উত্তেজনার পুলকে কাঁচুলি ছিঁড়ে গেল, ভেঙে গেলো বাহুর বলয়। পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন; রাধার কর কম্পিত হলো এবং আবেগে কণ্ঠরোধ হলো—বাক্য নিঃসৃত হলো না। রাজা শিবসিংহ, যাঁর প্রসাদে এই পদ রচিত হলো, তাঁর দেহকান্তি শ্যামসুন্দরের মতোই সুন্দর রূপবান।

বিদ্যাপতি—আগেই আলোচনা করেছি।

১৭

আলো মুঞি জানো না········

পদকর্তা জ্ঞানদাস এই পদে রাধার পূর্বরাগের কাতরতা দেখে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। রাধা বলছেন, ওলো সখি! আমি ঠিক জানতাম্ না—জানলে কখনই কদম্বের তলায় যেতাম না। নাগর কৃষ্ণ এইভাবে ছলনা করে' আমার মন চুরি করে নিল। আমার চোখ দুটি কৃষ্ণের রূপের সাগরে ডুবে রইল। যৌবনের স্বপ্নময় উদ্যানে প্রবেশ করে আমার এই রূপমুগ্ধ চিত্ত যেন বাইরে আসবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, যেন রূপের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে। ঘরে ফিরে যাবার পথ আজ আমার কাছে যেন সীমাহীন, কারণ সংসার ও আমার মনের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান রচিত হয়েছে। ভেতরে ভেতরে আমার হৃদয় তো বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, প্রাণ তো আকুপাকু করছে। চন্দন ও চাঁদের মধ্যে মৃগমদ থাকায় মনে হচ্ছে যেন তার মধ্যে আমার হৃদয়পুত্তলি বাঁধা দিয়েছি। কটিতে পীতবসন, তাতে মনে হচ্ছে যেন নানা কথা তাতে জড়িয়ে আছে। বিধাতা কি কুলকলঙ্কের অঙ্কুর সৃষ্টি করলেন এইভাবে? আমার জাতি, কুলশীল সবই বুঝি জলাঞ্জলি দিলাম। পৃথিবীতে আমার কলঙ্কের কথাই শুধু প্রচারিত হলো। কুলবতী সতী হয়েও আমি দু'কুলেই দুঃখ দিলাম। এই আমার নিয়তি,

আমার পাওনা? পদকর্তা জ্ঞানদাস অভয় দিয়ে বলেন, চিত্ত দৃঢ় কর, সাহসে বুক বাঁধ।

জ্ঞানদাস—আগে আলোচনা করেছি।

১৮

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি........

পদকর্তা চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত পদ। এই পদে কবি বলছেন, রাধা-কৃষ্ণের এই পূর্বরাগ এমন অদৃষ্টপূর্ব যে তিনি এমন প্রেমের কথা কখনও শোনেননি বা দেখেননি। এ দেখ্‌ছি দুজনের প্রাণের সঙ্গে প্রাণ একেবারে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। দু'জনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়েও নিজেদের ভাবী বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে কাঁদছেন। মুহূর্তের জন্য একে অপরকে না দেখলে তাঁরা যেন মরে যান। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, এঁদের তেমনি একজন ছাড়া যেন অন্যজন বেঁচে থাকৃতে পারে না। এরকম প্রেমের কথা মানুষের মধ্যে কখনও শোনা যায় না।

তবে এ প্রেমের তুলনা কোথাও আছে কি? সূর্য এবং পদ্মফুল পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনায় সে প্রেম কিছু নয়। কেননা, শীতকালে পদ্মফুল মরে গেলেও সূর্য যথারীতি সুখে থাকে। একজনের সুখদুঃখের সমভাগী যদি অন্যজন না হয়, তবে সে প্রেমের সঙ্গে কি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা চলে?

চাতক ও মেঘের পরস্পরের প্রেমের কথা আমরা বলে থাকি। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে কারুরই তুলনা হয় না। কারণ সময় না এলে (বর্ষাকাল) মেঘ চাতককে এক বিন্দু জল দেয় না। তাই এ প্রেম তো চিরকালের, নিত্যকালের নয়।

ফুল ও ভ্রমরের যে ভালবাসার কথা বলে থাকি আমরা, তার সঙ্গেও এই প্রেমের তুলনা চলে না। কেননা, ভ্রমর ফুলের কাছে না এলে মধু তো পাবে না। ফুল নিজে গিয়ে তাকে মধু দিয়ে আসে না অর্থাৎ এ প্রেমে দুজনের সমান আগ্রহ নেই।

চাঁদ ও চকোরের প্রেমও এদের প্রেমের কাছে তুচ্ছ, কেননা চাঁদের অমৃত পান করে চকোর। তাদের তো পারস্পরিক আকর্ষণ তীব্র নয়। তাই চণ্ডীদাস বলছেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেম অতুলনীয়। জীবজগৎ ও প্রকৃতির রাজ্য কোথাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অপার্থিব মহিমা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারুর সঙ্গেই এই প্রেমের তুলনা চলে না।

চণ্ডীদাস—চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবির অস্তিত্ব বাঙলা সাহিত্যে আজও এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন। তবে নানা পণ্ডিতের মতের যোগবিয়োগ করে' যে সারনির্যাসটুকু আমরা পাই, তাতে এটুকু বলা যেতে পারে যে, চণ্ডীদাস নামে অন্ততঃ দুজন কবি ছিলেন। একজন চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যজন চৈতন্যপরবর্তী কবি পদাবলী চণ্ডীদাস। আর একজন 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত পদকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কোন পণ্ডিত জোরাল যুক্তি দেখিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য পদকর্তা পদাবলী চণ্ডীদাস বা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত কবি। এই কবির কবিত্ব নিয়ে আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি।

চণ্ডীদাসের জীবনকথা নানা কিংবদন্তী ও গালগল্পে পরিপূর্ণ। এই স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে থেকে তাঁর জীবনকাহিনীর সত্য অংশটুকু উদ্ধার করা আজ দুঃসাধ্য। অসিতবাবু তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য় খণ্ডে) নানা কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। আমরা তারই একটি উল্লেখ করলাম—"ব্রাহ্মণবংশে নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নকুল। নকুল সমাজে বেশ মান্যগণ্য ছিলেন। চণ্ডীদাস শাক্ত দেবী বাশুলীর সেবক হইলেও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উপাসক ছিলেন এবং রামীকে সহজিয়া প্রেমতত্ত্বের যথার্থ সাধিকা জানিয়া তাহার প্রেমে উন্মাদ হইয়া পড়েন।...রজক-কন্যার সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রীতির সংবাদে লোকে তাঁহাকে নীচ প্রেমে উন্মাদ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিল। স্থানীয় রাজাও তাঁহাকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন রাজা চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ

ভ্রাতাকে বলিলেন যে, চণ্ডীদাসকে নীচ সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে জাতে তুলিতে হইবে। নকুল জ্যেষ্ঠের কাছে গিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, "ধোবিনী ছাড়হ ভাই জাতে উঠ তুমি।" কিন্তু চণ্ডীদাস সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বলিলেন, "সর্বস্ব ধোবিনী মোর এ ভূমি আকাশ।" যাহা হউক, চণ্ডীদাসের সঙ্গে আলাপে নকুলের সমস্ত সংশয় কাটিয়া গেল, তিনি রামীর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে নকুলের নিকট এ সংবাদ জানিতে পারিয়া সকলে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রতি বৈরিতা ত্যাগ করিল। নকুল রামীর নিকট সহজ তত্ত্ব শিক্ষা করিলেন।" তবে এসব কিংবদন্তী নিয়ে কবির কবিত্ব বিচার চলে না বা তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রভাব কাব্যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছে, তা-ও আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

১৯

কাহারে কহিব মনের মরম কেবা যাবে········

আলোচ্য পদটিও পদকর্তা চণ্ডীদাসের। শ্রীরাধা পূর্বরাগে চঞ্চলা হয়ে বলছেন, মর্মের জ্বালার কথা কাকে বলবো, আর কেই বা তা বিশ্বাস করবে? হৃদয়ের মধ্যে যে মর্মবেদনা, তাতে চিত্ত সর্বদাই চমকিত হচ্ছে। সর্বদাই চোখ ছলছল্ করে বলে' গুরুজনের সামনে দাঁড়াতে পারি না—পাছে সবাই এই প্রেমের কথা টের পেয়ে যায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, সবই শ্যামময়। দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। সখির সঙ্গে যখন যমুনার জলে যাই, তাতে যা দেখি তা আর বল্‌বার নয়। যমুনার কালো জল চোখের সামনে ঝলমল করতে থাকে। তা দেখে মনকে ধরে রাখা কি সম্ভব? কারণ সেই কালো জলে যে কৃষ্ণের ঝলমলে কালো রূপের কথা মনে পড়ে। এ কথা আজ সকলের কাছে স্বীকার করছি যে কুলের ধর্ম আর রাখ্‌তে পারলাম না। পদকর্তা চণ্ডীদাস আশ্বস্ত করে' বলছেন, সুনাগর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তোমার হৃদয়ে বিরাজ করছেন।

চণ্ডীদাস—পূর্ববর্তী পদে আলোচনা করেছি।

২০

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার.......

আলোচ্য পদটিও চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত পূর্বরাগের পদ। নব অনুরাগে বিভোর শ্রীরাধা ঘরের বাইরে গিয়ে বার বার দাঁড়াচ্ছেন—যদি একবার কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায়। অস্থির চিত্তে তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে ঘরের বাইরে আসছেন, আবার ঘরের মধ্যে যাচ্ছেন। তাঁর মন উদ্বিগ্ন, ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে—এই চঞ্চলতা নিয়ে তিনি বার বার কদম্ব কাননের দিকে তাকাচ্ছেন।

শ্রীরাধার এমন দশা হল কেমন করে? তা না হলে তিনি গুরুজনকে ভয় পাচ্ছেন না, দুর্জনের নিন্দার ভয়কেও তুচ্ছ করছেন। তবে কি কোনও অপদেবতা তাঁর উপর ভর করেছে? এমনই তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য যে বসনের আঁচল দিয়ে লজ্জানিবারণের চেষ্টাও করছেন না। তিনি বসে থেকে থেকে হঠাৎ চমকে চমকে উঠ্‌ছেন, দেহের অলঙ্কার খুলে খুলে যাচ্ছে। রাধা একে অল্পবয়সী, তাতে আবার রাজকন্যা এবং কুলবধূ। মনে মনে কোন্ আকাঙ্ক্ষাকে তিনি লালন করছেন? কিসের প্রত্যাশা করে' রাধা তাঁর লালসাকে বাড়িয়ে চলেছেন? তার এ ধরনের আচরণের রহস্য বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। তবে তাঁর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন চাঁদ পাবার আশায় হাত বাড়িয়েছেন। পদকর্তা চণ্ডীদাস অনুনয় করে বলছেন, রাধা কৃষ্ণের ফাঁদে মনকে ধরা দিয়েছেন।

চণ্ডীদাস—আগে আলোচনা করা হয়েছে।

২১

চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি...

পদকর্তা গোবিন্দদাস নব অনুরাগে চঞ্চলা রাধার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে দেখে বলছেন, চলচলে তরল অঙ্গকান্তি যেন ভূতল দিয়ে বয়ে চলেছে। অর্থাৎ সেই অপরূপ কাঁচা চলচলে অঙ্গলাবণ্য যেন পৃথিবীতে ভেসে যাচ্ছে। তাঁর মুচ্‌কি হাসি এমনই মনোরম যে, তাঁর তরঙ্গ-হিল্লোলে স্বয়ং কামদেবই যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। কোন্ সে নাগরকে কোন্ পরমক্ষণে

দেখ্‌লাম যে ধৈর্যের বাঁধ আমার ভেঙে পড়লো। সেই থেকে আমার চিত্ত সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে কেনই বা কাঁদছে, তাও তো বুঝতে পারছি না। নাগর কৃষ্ণ হেসে হেসে অঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে নেচে নেচে চলে যান। তাঁর নয়নের কটাক্ষশরে আমার প্রাণকে যে বিদ্ধ করতে চায়! তাঁর বুকের ওপর মালতী ফুলের মালাটি গলা থেকে ঝুলছে। আমার মন যেন মত্ত ভ্রমরের মতো উড়ে গিয়ে তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটার ছটা—তা যেন আমার বুকের মধ্যে লেগে আমার বুককে জুড়িয়ে দিচ্ছে। জানি না, কোন্ ব্যাধিতে আমি আক্রান্ত, আমার মনকে যা এভাবে বিদ্ধ করেছে। লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে তো একথা বলতেও পারছি না। নারীর প্রাণ এমনই কঠিন যে, সে প্রাণ সহজে বের হতে চায় না। পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, রাধার এই অবস্থার পরিণাম ভেবে আমি চিন্তিত, শেষে কি যে হবে জানি না!

গোবিন্দদাস—আগে আলোচনা করা হয়েছে।

২২

বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম······

পদকর্তা হিসেবে আমরা রামানন্দ বসু-র নাম পাই। কিন্তু পদের প্রকাশ-রীতি বিচার করে' কোনও কোনও পণ্ডিত এই পদটি চণ্ডীদাসের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। রাধা বেলাশেষে একা যমুনায় গিয়েছিলেন জলের জন্য। সেখানে যমুনার জলের মধ্যে শ্যামরায়ের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধা শ্রীরাধা ভাবছেন, কানু বুঝি জলের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। তাঁর মাথায় ফুলের চূড়া, হাতে মোহন বাঁশি। কৃষ্ণ আবার বুঝি জলের ভেতরে লুকোলেন। কারণ জলে ঢেউ দেখা দিলে প্রতিবিম্ব তো অদৃশ্য হয়ে যাবেই। যমুনাতে ঢেউ দিলে সহসা জলবিম্ব দেখা গেল—তার মধ্যে কৃষ্ণকে দেখা গেল। চূড়া তাঁর বাঁদিকে হেলে আছে, ত্রিভঙ্গমূর্তিতে শ্যামরায় দাঁড়িয়ে আছেন। এ রূপ দেখে রাধা ভাবছেন, তাঁর কুলমর্যাদা রক্ষা করাই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে—এমনই তীব্র কৃষ্ণের আকর্ষণ। জলে আবার ঢেউ দেখা দিলে প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার জল স্থির হলে

প্রতিবিম্ব আবার দেখা যায়। তাঁকে ধরবো ধরবো মনে করেও ধরতে পারলাম না। প্রেমানুরাগে তাই জলে ডুব দিয়েছিলাম, যদি তাঁকে ধরতে পারি। কিন্তু হাত বাড়িয়েও শ্যামের নাগাল পেলাম না। ব্যর্থতার বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে এলাম। রাধা নিজেকে অভাগিনী বলে ধিক্কার দিয়ে বলছেন, আমি অভাগিনী বলেই শ্যামের নাগাল পেলাম না। সেই বেদনায় হৃদয় আমার বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পদকর্তা রামানন্দ বসু আশ্বাস দিয়ে বলছেন, হে রাধিকে! তুমি বৃথাই জলে ডুব দিয়েছিলে। তুমি বুঝতে পারনি যে শ্যাম ছিলেন কদম্বের মূলে এবং তাঁরই অঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়ে জলে পড়েছিল। এই মায়া তুমি বুঝতে পারনি ?

রামানন্দ বসু—কুলীন গ্রামের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা গুণরাজ খান মালাধর বসুর সুযোগ্য বংশধর রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। এই গ্রামকে মহাপ্রভু অত্যন্ত ভালবাসতেন। রামানন্দ বসু কুলীন গ্রামের ভক্তদের নিয়ে প্রতি বছর রথের সময়ে নীলাচলে উপস্থিত হতেন এবং বেশ কয়েকমাস মহাপ্রভুর সঙ্গে বাস করতেন। মহাপ্রভুও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মালাধর বসুর কাব্যও শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

রামানন্দ বসু ভনিতাযুক্ত সাতটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে চারটি কৃষ্ণলীলার, দুটি চৈতন্যলীলার এবং একটি নিত্যানন্দকে নিয়ে রচিত। কবির পদগুলির মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার স্পর্শ আছে।

২৩

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি……

পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীরাধার শ্যামরূপ দর্শনের দ্বারা পূর্বরাগ সঞ্চারের চিত্র এই পদে বর্ণনা করেছেন। শ্রীরাধা বলছেন, শ্যামের রূপে আমার চোখ ভরে গেল। তাঁর মিষ্টি স্পর্শের কথা স্মরণ করে' আমার অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। সে পুলকের যেন শেষ নেই। তাঁর মোহন বাঁশীর সুরে কান আমার ভরে যায়, তাই অন্য কোনও প্রসঙ্গ সেখানে প্রবেশ করে না। সেজন্যই বলছি,

সখি! তোমার উপদেশ দিয়ে কোনও লাভ নেই—তা-ও প্রবেশ করবে না কর্ণপথে। কৃষ্ণের অনুরাগে আমার দেহমন মেতে উঠেছে, ধর্মের কথা কণামাত্র এ অবস্থায় শোনা যাবে না। আমার নাসিকা সেই অঙ্গের সৌরভে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, মুখে তাই অন্য নাম উচ্চারণের উপায় নেই। তাঁর নতুন নতুন গুণে আমার মন বেঁধে ফেলেছে। সেখানে কোথায় আর ধর্মের স্থান হবে? স্বামী বা গৃহের আত্মীয়স্বজনের তর্জন গর্জনে মনে মনে হাসি পায়, কারণ তারা তো বোঝে না যে আমার মন আমার নিয়ন্ত্রণে আর নেই। গোবিন্দদাস জিজ্ঞাসা করছেন, এটাই একমাত্র কামনা যে মন যেন অনুরক্ত হয় তাঁর প্রতি।

গোবিন্দদাস—আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

২৪

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে……

আলোচ্য পদটি জ্ঞানদাসের অন্যতম বিখ্যাত ও সার্থক পদ। এখানে রাধার নব অনুরাগে চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। রাধা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপের অপরূপতায় চোখে আমার জল আসে, গুণের মহিমায় মন হয়ে ওঠে বিভোর। ফলে প্রিয়মিলনের জন্য প্রতি অঙ্গের জন্য আমার প্রতি অঙ্গ আকুল হয়ে ওঠে। তাঁর হৃদয়ের স্পর্শলাভের আশায় হৃদয় আমার বেদনাকাতর হয়ে ওঠে। ফলে তাঁর প্রেমলাভের জন্য প্রাণ আমার স্থির থাকতে পারছে না। সখি! এ অবস্থায় তোমায় আর কি-বা বলবো? মনে মনে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা অবশ্যই পালন করবো। এই রূপ দেখে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আমার পরিতৃপ্ত হয় না। মনের সব কথা কি প্রকাশ করে বলা সম্ভব? তাঁকে দেখে যে কত সুখ তা ভাষায় কি বলবো, তাঁর দর্শন ও স্পর্শলাভের জন্য চিত্ত আমার আকুল হয়ে উঠেছে। তাঁর হাসিতে কত যে মধুর স্রোতধারা ঝরে পড়ে, তাঁর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি-ই যেন প্রেমের সারবস্তু। গুরুজন ও পূজনীয়দের মধ্যে যখন সখীদের সঙ্গে থাকি, তখন শ্যামের প্রসঙ্গ আলোচনা হ'লেই মন আমার পুলকে ভরে ওঠে। এই পুলকরোমাঞ্চ যাতে বাইরে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে, তার জন্য

কতরকমের ছলাকলাই না করি। শুধু চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে। এই চোখের জলই বুঝি গোপন করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ফলে ঘরের সকলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কানাকানি করে। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলছেন, লজ্জা ও গৃহে আগুন জ্বালিয়ে দাও অর্থাৎ গৃহ ও লজ্জাকে বিসর্জন দিয়েই শ্রীরাধার এই প্রেমের প্রকাশ।

জ্ঞানদাস—আগেই আলোচনা করেছি।

২৫

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি·······

আলোচ্য পদটি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ। পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে পূর্বরাগ সঞ্চারের চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যেখানে যেখানে রাধার ক্ষীণদেহের লাবণ্য-জ্যোতি নিঃসৃত হয়, সেখানে সেখানে তাঁর গৌরবর্ণের দেহজ্যোতিতে যেন বিদ্যুৎ চমকায়। যেখানে যেখানে শ্রীরাধার রক্তাভ চরণ চঞ্চলভাবে চলে যায়, সেখানে সেখানে যেন স্থলপদ্মের পাপ্‌ড়ি স্খলিত হয়। হে সখি! দেখতো, এ কোন্ নারী যে সহচরীদের সঙ্গে মিলে আমার জীবন নিয়ে খেলা করছে? যেখানে যেখানে তাঁর বাঁকা চঞ্চল কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়, সেখানে সেখানে যেন কালিন্দীর ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে পড়ে। যেখানে যেখানে তাঁর চটুল চাহনি পড়ে, সেখানে সেখানে যেন নীল পদ্মে বন ভরে যায়। যেখানে যেখানে তাঁর মধুর হাসি দেখি, সেখানে সেখানে যেন শ্বেতকুন্দ ও কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়। পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, কানু নবপ্রেমে মুগ্ধ হয়েছেন, তাই রাধাকে চিনেও যেন চিনতে পারছেন না।

গোবিন্দদাস—আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

২৬

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা·······

আলোচ্য পদটি চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত ও সার্থক পূর্বরাগের পদ। আলোচ্য পদে চণ্ডীদাস রাধার পূর্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, মহাপ্রভুর

জীবনে অনেকটা এইরকমই অবস্থা দেখা গিয়েছিল। "ভগবৎ প্রেমের উদয় হইতেই মহাপ্রভু একা নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন—চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।"

শ্রীরাধার মনে কিসের ব্যথা জেগেছে—যেজন্য তিনি সর্বদা একলা একলা নির্জনে বসে থাকেন, কারুর কথা শুনতে চান না। তিনি সর্বদাই ধ্যানস্থ হ'য়ে মেঘের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, মেঘের রঙ কৃষ্ণের মতো কালো তো! তাঁর খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কোনও আগ্রহ নেই এবং যোগিনীর মতো গেরুয়াবসন পরিধান করে আছেন। নিজের বেণীবদ্ধ কেশরাশি খুলে ফুলের আভরণ ফেলে দিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, চুলের রঙ যে কৃষ্ণের মতো কালো! হাসি হাসি মুখে শ্রীরাধা কৃষ্ণ ভেবে কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে কি যেন বলতে চান। একদৃষ্টে লক্ষ্য করেন ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের রঙ। তা যে কৃষ্ণের মতো কালো! পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, কৃষ্ণের সঙ্গে নবপরিচয়ের জন্যই শ্রীরাধার এই ধরনের আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে।

চণ্ডীদাস—আগেই আমরা আলোচনা করেছি।

২৭

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম........

চণ্ডীদাসের আলোচ্য পদটিও একটি সুখ্যাত ও সার্থক পূর্বরাগ বিষয়ক পদ। নামরূপের যে মাধুর্য, তা ভগবৎ-প্রেমের ঐকান্তিকতায় সম্ভব। এখানে তারই সার্থক প্রকাশ।

শ্রীরাধা তাঁর সখীকে বলছেন, সখি! কে তাঁকে শ্যামের নাম শোনাল। যে নামের মহিমা কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে আমার প্রাণকে আকুল করে তুললো। শ্যামের নামটুকুর মধ্যে এতো মাধুর্য লুকিয়ে আছে! এই নামের মধুর স্বাদ যেন মুখ ছাড়তে চাইছে না। এই নাম জপ করতে করতেই দেহ আমার অবশ হ'য়ে গেল। তাঁকে কিভাবে পাওয়া যাবে তা-ই জানতে চান রাধা সখীর কাছে। রাধা বলেন, নামের প্রতাপেই যখন এমন অবস্থা হয়,

তাঁর অঙ্গের স্পর্শ পেলে না জানি কি অবস্থা হবে? এই নামধারীর দেহের রূপ দেখে যুবতীরা তাদের সতীত্বধর্ম কি করে অটুট রাখে? তাঁকে ভুলতে চাইলেও ভুল্‌তে তো পারি না—আমি এখন কি করবো, আমার গতি কি হবে? পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস বলছেন, সতীসাধ্বী রমণীরাও তাঁর নাম শুনে ও রূপ দেখে সেধে নিজের যৌবন তাঁর কাছে বিলিয়ে দেয়। নিজত্বের অহমিকা ত্যাগ করে' যুবতীরা সেই শ্যামের কাছে নিজেদের সর্বস্ব দান করে।

চণ্ডীদাস—আগে আলোচনা আছে।

২৮

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়......

পদকর্তা শ্রীরাধার আবেগানুভূতির কথা এখানে বর্ণনা করেছেন। শ্রীরাধা সখিকে তাঁর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগজনিত অনুভূতির কথা বল্‌তে গিয়ে বল্‌ছেন, সখি! তাঁকে অনুভবের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? সে অনুভূতি কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? এই প্রেম নিত্যনতুন রূপে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে, তা তো কখনও পুরনো হয় না। তাই এই অনুরাগের মহিমা বর্ণনা করতে গেলে তা তো জড়বস্তুর মতো এক অবস্থায় থাকে না, তা প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে নিত্যনবরূপে প্রকাশ পায়। এক রকম ভাষা দিয়ে নিত্য পরিবর্তনশীল এই প্রেমের গতি-প্রকৃতি কি বর্ণনা করা যায়? জন্মাবধি আমি তাঁর রূপ দেখে আস্‌ছি, তবুও তো আমার দু'চোখে তৃপ্তি পেলাম না অর্থাৎ দেখার আশ মিট্‌লো না এতো দেখেও। তাঁর সেই মধুর বচন কর্ণে বার বার শুন্‌লাম, কিন্তু তা শ্রুতিপথে গিয়েও যেন স্পর্শ করলো না অর্থাৎ শুনেও যেন শোনার আশ মিট্‌লো না, আবার শোনার সাধ জাগ্‌লো। কত বসন্ত-রাত্রি ক্রীড়া-কৌতুকে কাটালাম, কিন্তু তবুও রতিক্রিয়ার রহস্য আমার কাছে যেন অজানাই রয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন ঘটিয়ে রাখ্‌লাম, তবুও তো হৃদয়ের তৃষ্ণা মিট্‌লো না। আরও রাখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা রইল। কত বিদগ্ধ রসজ্ঞ ব্যক্তি, রসাস্বাদে নিমগ্ন হয়ে থেকেও এই প্রেমের মর্ম বুঝেছেন বলে' মনে হ'ল না।

কারুর মধ্যেই এই রসবোদ্ধা মানুষ দেখ্‌লাম না। পদকর্তা কবিবল্লভ (কারুর মতে বিদ্যাপতি) বলছেন, যাঁর অনুভবে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, এমন ব্যক্তি লক্ষজনের মধ্যে একজনকেও পেলাম না।

কবিবল্লভ—আলোচ্য পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় প্রচারিত। কিন্তু কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এটি কবিবল্লভের পদ বলে' উল্লেখ করেছেন। 'কবিবল্লভ' ভণিতায় আর কোনও পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সুতরাং এই পদকর্তা সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জানা যায় না।

২৯

হাথক দরপণ মাথক ফুল……

পদটি বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পূর্বরাগের পদ। পদটির **আলোচনা-টীকায়** এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শ্রীরাধা বলছেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমার কাছে হাতের দর্পণের মতো অতি প্রিয়। তুমি আমার কাছে মাথার ফুল, নয়নের কাজল, মুখের পান, বক্ষের কস্তুরী-লেপন, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সারবস্তু। পাখীর পাখনা যেমন অপরিহার্য, মাছের যেমন জল, জীবের যেমন জীবন অপরিহার্য, হে কৃষ্ণ! তুমি-ও আমার কাছে তেমনি অপরিহার্য ও মুহূর্তমাত্র তুমি ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এতো ভালবেসেও তুমি যে কে, সে রহস্য আজও বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। ভক্ত ভগবানের বিরাটত্ব বুঝে উঠ্‌তে পারে না, চেষ্টা করে তাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু তাঁর রহস্যকে ভেদ করতে পারে না—তিনি কে? তবুও তিনিই আমার সর্বস্ব। তাই রাধার এই আকুলতা। হে মাধব! তুমিই বলে দাও, তুমি কে? কি তোমার স্বরূপ? বিদ্যাপতি বলছেন, তোমরা দুজনেই পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ ভক্তের প্রেমও যেমন অসীম, ভগবানের রহস্যও তেমনি অনন্ত। এভাবেই চলেছে ভক্ত-ভগবানের অনন্ত লীলায় রহস্যভেদের চেষ্টা।

বিদ্যাপতি—আগেই আলোচনা করেছি।

অভিসার

আমরা ভূমিকায় বলেছি, পথের বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সংকেতকুঞ্জে শ্রীরাধিকার যে গোপনযাত্রা, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাকেই বলে অভিসার। সাধারণভাবে 'অভিসার' বলতে আমরা বুঝি নায়কের প্রতি অনুরাগবশত নায়িকার সঙ্কেতস্থানে গমন করা অথবা নায়িকার প্রতি অনুরাগবশত নায়কের সঙ্কেতস্থানে যাত্রা। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা নায়িকার 'অভিসার' পদেরই প্রাধান্য দেখি। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা 'অভিসারিকা' বল্‌তে বুঝি নায়িকার অভিসারযাত্রা অথবা নায়ককে অভিসারযাত্রা করানো।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসারযাত্রার আটটি রূপ বর্ণনা করা হয়েছে—জ্যোৎস্না, তামস, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, সঞ্চরা ও উন্মত্তা। এই পদগুলির একটা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা পদগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অভিসারের মধ্যে মিলনের প্রত্যাশায় নায়িকার বিপদবরণ, দুর্জয় সাহস ও দুঃখকষ্টভোগের একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার আকুলতা ও গৃহকর্মের বাধাকে উপেক্ষা করে', লোকলজ্জা ও নিন্দাকে উপেক্ষা করে' প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা অভিসার পদগুলিতে বিশেষ তাৎপর্য ও রোমান্টিকতা দান করেছে। ঈশ্বরের আহ্বান ইঙ্গিতে শুনে ঈশ্বরের অন্বেষণে যাত্রা-ই তো অভিসার। সংসারের মোহবাসনায় আমরা মত্ত হয়ে আছি বলে সে আহ্বান শুনেও শুন্‌ছি না। কিন্তু যার কানে সে আহ্বানের গভীরতা একবার সাড়া তুলেছে, যার মন সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য তৈরি সবকিছু জাগতিক লাভক্ষতিকে উপেক্ষা করে—সেটাই হবে মানবাত্মার অভিসারযাত্রা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার হচ্ছে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মার অভিসারযাত্রা—স্বকীয়া সংসারে থেকে পরকীয়ার জন্য আকুলতা।

অভিসারের জন্য নিজের মনকে তৈরি রাখ্‌তে হবে। ঈশ্বর যে কখন কাকে আহ্বান জানাবেন, তার তো স্থিরতা নেই। তাই যখন সেই বাঁশীর আহ্বান কানে এসে প্রবেশ করবে, তখন সব কিছুকে তুচ্ছ করে' ছুটে যেতেই হবে।

তাই তো প্রস্তুতি! তাই তো সাধনা!! শ্রীরাধার অভিসারযাত্রার জন্য প্রস্তুতি বা সবরকম বাধা অতিক্রমের শিক্ষা গ্রহণ করতে তো হবেই। সবরকমের বাধাকে অতিক্রম করতে না পারলে সেই পরমপুরুষের সঙ্গে মিলন কি সম্ভব?

বৈষ্ণব পদাবলীতে গোবিন্দদাসের অভিসারবিষয়ক পদ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন বাধাকে অতিক্রম করার দুর্জয় তপস্যায় রাধার আচরণের চিত্র পদকর্তারা বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানদাস ও রায়শেখরের কয়েকটি পদও চিত্রধর্মিতায় ও নীতিধর্মে সার্থক। শুধু কি ভক্ত? ভক্তকে না পেলে ভগবানেরও উপায় নেই। তাই আকুলভাবে সবকিছু বাধাকে উপেক্ষা করে যাত্রার ফলে ভগবানও ভক্তের জন্য প্রতীক্ষারত।

৩০

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি……

পদকর্তা গোবিন্দদাস দুর্গম অভিসারযাত্রার শেষে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন-মহিমা বর্ণনা করেছেন। ভক্ত প্রেমিকা রাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে এগিয়ে এসে শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ের ওপর তুলে নিলেন এবং নিজের কোলের ওপর আবার তাঁকে বসালেন। নিজের করপদ্ম দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চরণযুগল মুছিয়ে দিলেন। রাধা যে পথশ্রমে কাতর! স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেই প্রেমের মূর্তিমান দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। কি আশ্চর্য ব্যাপার! যাঁর দর্শন পেলে জীবন ধন্য হয়, সব দুঃখ দূর হয়ে যায়, সেই কৃষ্ণ স্বয়ং আজ শ্রীরাধার চরণ সেবা করছেন। চন্দ্রকিরণে শীতল যে জল, সেই জলে হাত ভিজিয়ে নিয়ে শ্রীরাধার মুখমণ্ডল পরিষ্কার করে দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সিক্ত পদ্মপাতার দ্বারা মৃদু মৃদু বাতাস করছেন তিনি আর জিজ্ঞাসা করছেন এই যাত্রাপথে তাঁর দুঃখকষ্টের কথা। ভক্তের সাধনার কৃচ্ছ্রতায় ভগবানের চিত্ত-ও সমবেদনায় ও প্রেমের মহিমায় আপ্লুত। তাই শ্রীকৃষ্ণ আঙুল দিয়ে চিবুক ধরে মুখে পান পুরে দিয়ে মিষ্টভাবে প্রেমভরে রাধাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন। পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, কৃষ্ণ প্রেমসাগরে

রাধিকার নিত্যনতুনভাবে অমৃতস্নান হচ্ছে। সাধনার যাত্রাপথ অতিক্রম করে' ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ও প্রসন্ন আবেগভরে ভগবানের ভক্তকে আপ্যায়ন ও গ্রহণ এখানে রাধার অভিসার শেষে কৃষ্ণমিলনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

গোবিন্দদাস—আগেই আমরা আলোচনা করেছি।

৩১

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা·······

পদকর্তা চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত ও সার্থক পদ। এই পদটি আসলে রসোদ্গারের পদ অর্থাৎ রাধা সখিদের কাছে নিজের অনুভূতির কথা বলছেন। 'বৈষ্ণব পদাবলী' (ক. বি.) গ্রন্থের টীকায় আছে, "ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না। পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্ত চিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। ···পাপীর কাছে আসিতে কণ্ঠকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।"

শুধু শ্রীরাধা নন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমিকার জন্য কষ্ট স্বীকার করেন। চণ্ডীদাসের এই পদে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখে রাধা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। বৃষ্টির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রাধার উদ্দেশ্যে অভিসারে বের হ'য়ে আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। তা দেখে দুঃখে বিদীর্ণ-হৃদয়া রাধা সখীকে বলছেন, এই দুর্যোগপূর্ণ রজনীতে আকাশে মেঘের সমারোহ, এ অবস্থার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে পথে এলেন? সখি! তোমাকে আর কি বলবো? কোন্ পুণ্যের ফলে কৃষ্ণের মতো বন্ধু আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এদিকে ঘরেতে গুরুজনরা রয়েছেন, বিশেষ করে মুখরা ননদিনী রয়েছে—সেজন্তে দেরী করে আমাকে বের হ'তে হয়েছে। সঙ্কেত করে তাঁকে ডেকে এনে তাঁকে কত না যন্ত্রণা দিলাম! এতো দেরী হবে, আগে তো ভাবিনি! বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের এই বহিঃপ্রকাশ দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে

বন্ধুর কাছে চলে আসি। আমার দুঃখে দুঃখী কৃষ্ণ নিজের কষ্টকেও সুখ বলে মনে করছেন। পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের মতো বন্ধুর প্রেমের কথা শুনে জগতের সকলেই সুখ অনুভব করবে। ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের এই আগ্রহ দেখে জগৎবাসী চমৎকৃত হবেই।

চণ্ডীদাস—আগেই আলোচনা হয়েছে।

৩২

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল ....

বর্ষা রজনীর দুর্গম পথে শ্রীরাধা অভিসারযাত্রা করতে চান। তাই অভিসারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। দুর্গম পথ অতিক্রমের জন্য নানাভাবে নিজেকে তৈরি করছেন। যাত্রাপথে যদি কণ্টক থাকে, তাই আঙিনার মাঝে কাঁটা পুঁতে তিনি কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছেন। নূপুরের শব্দে পাছে কেউ তাঁর যাওয়ার কথা টের পেয়ে যায়, সেজন্য তিনি বস্ত্র দিয়ে নূপুর ঢেকে তাঁর চরণপদ্মকে সহনশীল করে তুলছেন। যদি পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে তাঁকে যেতে হয়, (জানি না তো কখন তাঁর আহ্বান সঙ্কেত তিনি শুনবেন।) তাই কলসী কলসী জল ঢেলে পথ পিছল করে' আঙুল চেপে চেপে চলার অভ্যাস করছেন। বর্ষাকালে পিছল পথে চলার অভ্যাস তো করতে হবেই। হে মাধব ! তোমার কাছে অভিসারযাত্রার জন্য শ্রীরাধার এই প্রস্তুতি। তাই নিজগৃহে রাত্রি জেগে দুস্তর পথ অতিক্রমের অভ্যাস করছেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা দুহাত দিয়ে চোখ দু'টো ঢেকে পথ চলার অভ্যাস করছেন, যদি অন্ধকার রাত্রে বন্ধুর কাছে যেতে হয়। সেজন্য অন্ধকারে পথ চলার অভ্যাস করছেন। হাতের কঙ্কণ পুরস্কারস্বরূপ দিয়ে তিনি সাপুড়ে বা ওঝার কাছ থেকে সাপের মুখ কিভাবে বন্ধ করতে হয়, তার কৌশল শিখছেন। অন্ধকার পথে সাপে কামড়াতে পারে তো। তাই এই ব্যবস্থা—যাতে সাপ না কামড়াতে পারে। গুরুজনের কথা তিনি শুনেও শুনছেন না। ফলে বধিরের মতো, এক কথা শুনে, অন্য কথার উত্তর দিচ্ছেন।

পরিজনরা যেসব কথা বল্‌ছেন, তা শুনে মুগ্ধা বা নির্বোধের মতো হাসতে থাকেন রাধা। তাঁর এই অবস্থার সাক্ষ্য আছেন পদকর্তা গোবিন্দদাস।

গোবিন্দদাস—আগেই আলোচনা করেছি।

৩৩

কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলুঁ……

পদকর্তা গোবিন্দদাস অভিসারিকা রাধার প্রিয়মিলনের তীব্র আকুলতার চিত্র এখানে বর্ণনা করেছেন। শ্রীরাধা তাঁর সখীদের বল্‌ছেন, কুল-মর্যাদারূপ কঠিন দরজা খুলে বের হয়ে এলাম আমি, এখন কাঠের দরজার বাধা আমার অভিসার-যাত্রা পথে তো তুচ্ছ বাধা। আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র গোষ্পদের মত অবহেলাভরে পার হলাম, এখন নদী কি তার চেয়েও দুস্তর বাধা? সখি! আমাকে আর পরীক্ষার মধ্যে ফেলো না। কেননা, হরি আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করছেন, একথা স্মরণ করামাত্র আমার মন যে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। মদনের কোটি শরে বিদ্ধ হয়ে যার দেহ অহর্নিশি জ্বলে পুড়ে মরছে, সেখানে বাদলধারায় তাকে আর কত বিদ্ধ করবে? তার গায়ে বৃষ্টির জল লাগে না। যার হৃদয় প্রেমের নিদারুণ দহনজ্বালা সহ্য করছে, বজ্রের আগুন তার কি করতে পারে? আমার জীবনই তো তাঁর চরণে সমর্পণ করেছি, এখন দেহের জন্য কিসের মায়া? পদকর্তা গোবিন্দদাস বল্‌ছেন, হে সুন্দরী! তুমি যে অভিসারে যাত্রা করছো, সখীরা তা বুঝতে পেরেছেন।

গোবিন্দদাস—আগে আলোচনা করেছি।

৩৪

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ……

রায়শেখর এই পদে শ্রীরাধার অভিসারযাত্রায় তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। শ্রীরাধা চলেছেন অভিসারে। আকাশে দারুণ ঘন মেঘ। প্রচণ্ড শব্দ করে' বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ও মেঘ ডাকছে। বজ্রপাতের ঝন্‌ঝন্ শব্দে চারদিক মুখরিত। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে। এই দুর্যোগের মধ্যে আমি প্রিয়তমের সঙ্গে কি

করে' মিলিত হব? সখি! আজ আমার বড় দুর্দিন। আমার প্রিয়তম অনেক কষ্ট স্বীকার করে' নিজে এগিয়ে এসেছেন সঙ্কেতকুঞ্জে। মেঘ যেন তরল হ'য়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে। ঘন মেঘ ঘোর রবে গর্জন করছে। আমার 'শ্যাম নাগর' কি করে' একাকী আমার পথের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রতীক্ষা করবেন? একথা স্মরণ করে আমার দেহ যেন অবশ হয়ে গেল, এবং অস্থির হয়ে তা থরথর করে কাঁপছে। গুরুজনদের দারুণ সতর্ক দৃষ্টি এখন দুর্যোগের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। সখি গো! এখন কি বসে বসে বিচার করার সময়? এসো তাড়াতাড়ি যাত্রা করি। এই দুর্যোগ মাথায় করে' অভিসারযাত্রা করবো কিনা, সে বিচারের অবকাশ এখন নেই। কারণ আমার জীবননাথ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতকুঞ্জে আগেই চলে গেছেন। আমার মনও অগ্রসর হয়ে আগেই সঙ্কেতকুঞ্জে চলে গেছে, এখন দেহটাকে নিয়ে যেতে এতো ভাবনা কিজন্য? পদকর্তা রায়শেখর পরামর্শ দিচ্ছেন, হে রাধে! আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি অভিসারে বেরিয়ে পড়। এইসব বিস্তৃত বাধাগুলি এমন কিছু জোরালো নয়। তাই তোমাকে অভিসার-যাত্রায় উৎসাহ দিচ্ছি।

রায়শেখর—সপ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত পদকর্তা ছাড়া যেসব পদকর্তা পদরচনা করেন, তাঁদের রচনা বৈচিত্র্যহীন, খ্যাতনামা পদকর্তাদের ব্যর্থ অনুকরণ। এঁদের মধ্যে দু'একজন কিছুটা স্বকীয়তা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রায়শেখর একজন। 'শেখর' কথাটিকে রেখে তিনি রায়শেখর, কবিশেখর ইত্যাদি নানা ভণিতা ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত তাঁর যে ১৭৯ পদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাতে ব্রজবুলি ও বাংলা দু'ভাষাতেই পদ রচিত হয়েছে। এঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবত গোবিন্দদাসের সামান্য পরবর্তী কালের। এঁর প্রকৃত নাম নাকি শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর। ইনি নিত্যানন্দবংশজাত এবং শ্রীখণ্ড কেন্দ্রের নেতা রঘুনন্দনের মন্ত্রশিষ্য হয়েছিলেন। এই কবি সম্ভবত বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ এঁকে ধনী এবং জমিদার সন্তান

বলে' বর্ণনা করেছেন—তাঁর ভণিতায় 'নৃপ' শব্দের উল্লেখ দেখে। এইসব তথ্য নানা অনুমানের ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত।

এই মতকে অস্বীকার করে' শ্রীসতীশচন্দ্র রায় বলেন—"রায়শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্তী কবি নহেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পূর্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন।" কিন্তু রায়শেখরের ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি যে গোবিন্দদাসের পরবর্তী কালের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। "বিদ্যাপতির মৈথিলী হইতে রূপান্তরিত ব্রজবুলির পদ এবং রায়শেখরের অনুরূপ ধরনের ব্রজবুলির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাই সম্ভব।....সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় কবি রায়শেখরের রচিত 'কবিশেখর' ভণিতায় পদের সহিত কবিশেখর বিদ্যাপতির অনেক পদ যে মিশিয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে।" বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ বা রাধার সখাসখীর কোন নাম নেই, কারণ রাধা-কৃষ্ণের সখাসখীর উল্লেখ ও নাম ইত্যাদি ব্যাপার চৈতন্য পরিকরদের কল্পনা। তাছাড়া ব্রজবুলি একরকম মিশ্র ও কেতাবী ভাষা। কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা "খাস মিথিলার জনসাধারণের কথ্যভাষা।" তাই আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আস্‌তে পারি, "কবিশেখর ভণিতায় বিদ্যাপতি কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া রায়শেখরের (তিনিও কবিশেখর ভণিতা ব্যবহার করিয়াছিলেন) পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়া গিয়াছে। ...তাই শেখর-কবিশেখর ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদে সখীসাধনা বা চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মের ছায়া আছে, সেই পদগুলি বাঙালী রায়শেখরের রচনা—পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না।" রায়শেখর তিনশ্রেণীর পদ রচনা করেছিলেন—(১) ব্রজবুলি; (২) সরল বাংলায় বিবৃতিমূলক পদ; (৩) চটুল ছন্দে 'ধামালি' অনুসরণে লেখা হাল্‌কা ভাষার পদ। আলোচ্য পদটি গোবিন্দদাসের অনুসরণে রচিত বর্ষাভিসারের একটি সার্থক পদ।

৩৫

মন্দির বাহির কঠিন কপাট……

পদকর্তা গোবিন্দদাস এখানে শ্রীরাধা ও তাঁর সখীদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে অভিসারের নানা বাধাবিপত্তির কথা বর্ণনা করেছেন। সখী রাধাকে বলছেন, তোমার প্রথম বাধা গৃহের বাইরে যে কঠিন সদর দরজা রয়েছে, তাকে অতিক্রম করা। যদি-বা তা পার হ'লে, চলবার সময়ে বিপজ্জনক কর্দমময় পথ তোমার দ্বিতীয় বাধা। তার ওপর বহুদূর আচ্ছন্ন করে' বৃষ্টি ঝেঁপে এসেছে যেন বর্ষা দোল খাচ্ছে। কিন্তু নীল শাড়ী কি এই বৃষ্টি আটকাতে পারে? হে সুন্দরি রাধা! তুমি এই দুর্যোগের মধ্যে কিভাবে অভিসারযাত্রা করবে? শ্রীহরি যে মানস-গঙ্গার অপর পারে বিরাজ করছেন। ("বৃন্দাবনে মানসগঙ্গা নামে একটি হ্রদ আছে।") ঘন ঘন প্রচণ্ড ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে' বজ্রপাত হচ্ছে, শুনলে মর্ম জ্বলে যায়, চম্‌কে ওঠে। দশদিক ব্যাপ্ত করে' বিদ্যুতের আলো যেন জ্বলিয়ে দিয়ে যায়, যা দেখ্‌লে চোখের তারা চম্‌কে ওঠে। এতো দুর্যোগেও যদি তুমি গৃহত্যাগ করে' অভিসারে যেতে চাও, তা হ'লে বুঝতে হবে প্রেমের জন্য তুমি নিজের দেহকেও উপেক্ষা করছো অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করতেও ভয় পাচ্ছ না। পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, এখন কি আর বাছবিচার করার সময় আছে, যে তীর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাকে তো চেষ্টা করেও থামানো যাবে না। কারণ যে প্রেমের তীব্রতায় শ্রীরাধা একবার আকর্ষিত হয়েছে, তাকে কি ফেরানো যায়? সব বাধা তুচ্ছ করে রাধা অভিসারে যাবেই।

গোবিন্দদাস—আগেই আলোচনা হয়েছে।

৩৬

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক……

পদকর্তা গোবিন্দদাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিসার-বিষয়ক পদ। ঈশ্বরের আহ্বান একবার কানে যাঁর প্রবেশ করে, পথের সমস্ত বাধা, সমস্ত কষ্টকে তুচ্ছ করে তিনি ছুটে যান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের আশায়। শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের

বংশীধ্বনির আহ্বান শুনে সব কিছু তুচ্ছ করে তাঁর কাছে এসে পৌছেছেন, তখন অভিসারিকা রাধা তাঁর আগমনের কষ্ট ও বাধাকে মাধবের কাছে বর্ণনা করে বলছেন, হে মাধব! আমার দৈবতুর্দশার কথা কি আর বলবো? যদি লক্ষ লক্ষ মুখ পাই, তবুও যেন পথভ্রমণের সমস্ত কথা বলে শেষ করতে পারবো না। যখন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে সবে দু'চার পা এগিয়েছি, চারদিকে অন্ধকার রাত্রি দেখে আমার শরীর নানা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগলো। অন্ধকার দুর্গম পথ, কিছুই দেখা যায় না, এমন সময়ে দু'পায়ে সাপ জড়িয়ে ধরলো। একে আমি গৃহবধূ, তার ওপর এমনি অমাবস্যার রাত্রি ও ঘোর বনপথ অতিদূর বিস্তৃত। তার ওপর আবার মেঘ থেকে অবিরলধারায় বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। আমি যে কোথায় যাব, তা-ই ঠিক করতে পারলাম না। একে আমার পা দু'টি কাদায় ঢেকে গেছে, তার ওপর আবার কাঁটা ফুটে তা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিন্তু তোমার দেখা পাবার আশায় এই সমস্ত কিছুকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত কষ্ট এবার দূর হয়েছে। তোমার মোহন বাঁশি যখন একবার কর্ণে প্রবেশ করলো, তখনই সমস্ত গৃহসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিলাম। পথের এই দুঃখকে তৃণের চেয়েও তুচ্ছ মনে হলো শ্রীরাধার—পদকর্তা গোবিন্দদাস তাই মনে করছেন।

গোবিন্দদাস—আগে আলোচনা করেছি।

৩৭

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার........

পদকর্তা জ্ঞানদাস দুর্যোগের অমানিশায় শ্রীরাধার অভিসার যাত্রার চিত্র বর্ণনা করেছেন। অন্তরে একবার যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের আহ্বান এসে পৌছোয়, তখন দুর্যোগের রাত্রি, বর্ষার মুখরতা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। মেঘাবৃত রজনীতে চারিদিক অতিশয় ঘন অন্ধকারে আবৃত। এমনি সময়ে রাধা চলেছেন অভিসারে। দশদিক পরিব্যাপ্ত করে' মেঘ ঝলসে উঠছে। সমস্ত দেহ, নীল বসনে আবৃত করে' রাধা চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে তাঁর দু'চারজন সহচরী।

তাদের সঙ্গে নিয়ে নবপ্রেমভরে চলেছেন শ্রীমতী। বজ্রগর্ভ মেঘ প্রবলবেগে বৃষ্টি হ'য়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে। এরই মধ্যে সুবদনী রাধিকা সঙ্কেতকুঞ্জ খুঁজে পেলেন। কিন্তু হায়! নিকুঞ্জে তো শ্রীকৃষ্ণ নেই! নিকুঞ্জনাথ শ্রীকৃষ্ণকে না দেখে পদকর্তা জ্ঞানদাস সন্ধানে চল্‌লেন যেখানে নাগররাজ রয়েছেন। রাধার হতাশায় বেদনাবিদ্ধ হ'য়ে পদকর্তা শ্রীমতীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনবাসনায় নিজেই চলেছেন তাঁকে খুঁজে দিতে।

জ্ঞানদাস—আগেই আলোচনা করেছি।

বংশীশিক্ষা

শ্রীরাধা বাঁশী বাজানো শিখ্‌তে চান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তাই তিনি অনুরোধ করে শ্রীকৃষ্ণকে বল্‌ছেন। হে কৃষ্ণ! বাঁশির কোন্ ছিদ্রে কোন্ তান ওঠে, তা আমাকে শিখিয়ে দাও। বাঁশির কোন্ ধ্বনিতে যমুনায় উজান বয়, রাধার প্রাণ চঞ্চল হয়, কদম্ব ফুল ফোটে। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলছেন, তুমি আমার মতো সাজগোজ কর। রাধাকে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজানো শেখালেন। এইভাবে যেন রাধা শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে যাবেন। রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? রাধাই তো শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বংশীশিক্ষা দিলেন। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস বংশীশিক্ষা ও নৃত্য-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন।

৩৮

আজু কেগো মুরলী বাজায়........

শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে বাঁশি শিখতে চাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কৃষ্ণের মতো বেশভূষা পরিধান করতে ও ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াতে বললেন। শ্রীরাধা অগত্যা তাই করলেন। দু'জনে বেশ পরিবর্তন করলেন। সখীরা দূর বনে পুষ্পচয়নে গিয়ে ফেরার পথে শ্রীরাধার বাঁশির স্বর শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, আজ এমন বাঁশি কে বাজাচ্ছেন? ইনি তো কৃষ্ণ নন্। এঁর গৌরবর্ণে বন যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সখীরা বল্‌ছে, আজ কে এমন বাঁশি বাজাচ্ছে। ইনি তো শ্যামরায় নন। কারণ এঁর দেহের গৌরবর্ণে চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। এমন করে' এঁর চূড়াটি কে-ই বা বেঁধে দিল? শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং ইন্দ্রনীলমণির মতো শ্যামবর্ণ—এতো নন্দের নন্দন কানু নয়। এর রূপ দেখে নবকান্ত দেহধারী বলে মনে হচ্ছে। নর্তকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের বেশ এ কোথা থেকে পেল? এর কণ্ঠে বনমালা অপরূপভাবে দুল্‌ছে। জানি না, কোন্ দেশ থেকে এ বেশ এসেছে! এমন রূপ কে সৃষ্টি করলো? এঁর বামে রয়েছেন কৃষ্ণবর্ণা এক নারী। ইনি-বা কে? ইনি কি এঁরই সঙ্গিনী?

সখীরা ইঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে এইভাবে কথা বলছে। কারণ সখীরা যাবার সময়ে দেখে গেছেন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ছিলেন। এখন তাঁরা গেলেন-ই বা কোথায়? এখন এই বিপরীত রূপ দেখ্‌ছি কেন জানি না। দু'জনের মনের ভাব-ই বোধ করি এরকমই। শ্রীকৃষ্ণ-রাধার মনোভাব বোঝা ভার। বোধ করি, এটাই তাঁদের লীলাখেলা। পদকর্তা চণ্ডীদাস মনে মনে হেসে বলছেন, এই রূপ পরিবর্তন কোনও দেশে ঘটবে কি?

অনেকে মনে করেন, শ্রীরাধারূপে শ্রীচৈতন্যের যে সাধনা, এ যেন তারই পূর্বাভাস। শ্রীচৈতন্যদেব গৌরবর্ণ ও রাধা সেজে কৃষ্ণের জন্য নটবর বেশে নৃত্য করতেন। রাধার ভাবদ্যুতি আস্বাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

চণ্ডীদাস—আগে আলোচনা আছে।

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

মিলনের বিপরীত হচ্ছে বিপ্রলম্ভ। তবুও মিলনের উৎকর্ষতার জন্য বিপ্রলম্ভ অপরিহার্য। বিপ্রলম্ভ চার রকম—পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, মান ও প্রবাস। "প্রেমের উৎকর্ষতাবশতঃ প্রিয়ের সন্নিধানে তাহার সহিত বিচ্ছেদভয়ে যে বেদনার উপলব্ধি, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।" সুতরাং এখানে বিরহের ইঙ্গিত প্রকাশ

পাচ্ছে। 'বৈচিত্ত্য' শব্দটির অর্থ 'ব্যাকুলতা'। নায়ক বা নায়িকা পরস্পরের কাছে থেকেও যদি তাদের অন্তরে বিরহের বেদনা জেগে ওঠে, যদি মনে হয়, প্রিয়তম যেন কাছে নেই। এই বিরহের বেদনাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও এক নয়। প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি দিক হচ্ছে আক্ষেপানুরাগ। এই বিরহই প্রেমের মাধুর্যকে আরও আস্বাদ্য করে' তোলে। এইজন্যেই শুধু লৌকিক প্রেমে নয়, ঈশ্বর-প্রেমেও বিরহের একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রেমের আস্বাদন "ইক্ষু-চর্বণের ন্যায়"—মুখ জ্বলে যায়, কিন্তু তবুও তার আস্বাদকে ছাড়া যায় না। ত্রিপুরাবাবু যথার্থই বলেছেন—"ভক্ত ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন, ভগবানও তাঁহাকে দেখা দেন। কিন্তু ভগবানের নিকট থাকিয়াও ভক্তের মনে হয়, যাঁহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিলাম, তাঁহাকে পাইলাম কই ?····তাঁহাকে যে ভুলিতে পারি না।···· আক্ষেপানুরাগের পদের মধ্যে ভক্ত হৃদয়ের এই সীমাহীন বেদনার সুরই ধ্বনিত হইতেছে।"

আক্ষেপানুরাগ নানাভাবে প্রকাশ পায়। রাধার আক্ষেপের অন্ত নেই।—

"কৃষ্ণকে, মুরলীকে আক্ষেপ, দূতীকে কয়ায়।
কভু যে আক্ষেপ উক্তি গুরুজনে হয়।
কুলে, শীলে আক্ষেপ, কথনও বিধাতাকে।
জাতিকে আক্ষেপ কভু, কভু আপনাকে॥
কন্দর্পকে নিন্দা, কভু আক্ষেপ সখীরে।
উল্লাস আক্ষেপরূপ কহিল বিচারে॥"

রূপ গোস্বামী বলেন, প্রেমবৈচিত্ত্য হেতু রাধার মনে আটটি আক্ষেপ প্রকাশ পায়। পণ্ডিতপ্রবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, "প্রিয়তমের দর্শন না পাইলে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলিয়া মনে হয়, আবার মিলন হইলে সন্দেহ হয়, পাইয়াছি তো ?···হয়তো এখনই হারাইব। মিলনের দীর্ঘ সময়কেও পল বলিয়া মনে হয়। মনে হয় এই তো এখনই ফুরাইয়া গেল।"

৩৯

কি মোহিনী জান বঁধু……

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের অনেক পদ পাওয়া যায়, যেগুলি প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ের—আক্ষেপানুরাগের পদগুলি আবেগের আন্তরিকতায় ও প্রকাশের সৌন্দর্যময়তায় উৎকৃষ্ট। আলোচ্য পদটিকে আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি।

রাধা ব্যাকুলচিত্তে বল্‌ছেন, হে প্রিয়তম! তুমি কি যাদু-ই জানো! তা না হ'লে আমার মতো অবলার প্রাণ নিতে তোমার মত এমন নিপুণ আর কে? তোমাকে পাবার জন্য আমার ব্যক্তিগত সংস্কার এমনকি প্রকৃতির বিধানকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছি। এত করেও আমি তোমার প্রেমের স্বরূপ আজও বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। অর্থাৎ ঘর-বার, পর-আপন, রাত্রিদিন সব কিছু ওলটপালট করে দিয়েও তোমার প্রেমের তাৎপর্য বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। স্রোতের শ্যাওলা যেমন স্রোতের যে দিকে তীব্র টান সেদিকে ভেসে যায়, তার নিজস্ব কোনও জোর থাকে না। ঠিক তেমনি তোমার প্রেমের তীব্র বেগে আমিও ভেসে চলেছি। নিজের ওপর আমার যেন কোনও প্রভুত্ব বা জোর নেই। এমন কোনও সংবেদনশীল ব্যক্তি নেই, যাকে বন্ধু বলে ডেকে নিজেকে খানিক লাঘব করতে পারি। একমাত্র তোমার দিকে তাকিয়ে আমি সমস্ত বেদনা সহ্য করেছি। এখন তুমিও যদি আমার প্রতি বিরূপ হও, তা হ'লে তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করা ভিন্ন আমার আর কি করার আছে? বাশুলী-দেবীর আদেশে পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, পরের জন্য আপন কি পর হয়ে যায়!

চণ্ডীদাস—আগেই আলোচনা করেছি।

৪০

যত নিবারিয়ে চাই, নিবার না যায়রে……

এই পদটিও প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাধার চিত্তব্যাকুলতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। রাধা বলছেন, যত চেষ্টা করি কৃষ্ণের কথা চিন্তা না

করায়, ততই যেন তা আরও বেশী করে' চিন্তা করায়। এমন কি অন্য কথা বল্‌তে চাই, কিন্তু সব কিছু ছেড়ে তা যেন কৃষ্ণকথার পথেই বার বার ফিরে আসে। আমার বাকৃশক্তিও যেন আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে, তা না হ'লে যার নাম করবো না বলে মনে করি, তার নামই বার বার উচ্চারিত হয়! আমার এই নাসিকা আমি যতই বন্ধ করতে চেষ্টা করি না কেন, ততই যেন এই নাসিকা দিয়ে শ্যামের গন্ধই পাই। মনে মনে ঠিক করি, তাঁর কথা কোনক্রমেই আর শুনবো না। কিন্তু কান আমার শ্যামপ্রসঙ্গে যেন আপনা-আপনি চলে যায়। আমার এইসব ইন্দ্রিয়কে শতধিক! তারা আর আমার বশে নেই, তাই আমার কথা শোনে না। সর্বদা সেই কানুই আমার অনুভবের বিষয় হয়ে আছে। পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, হে রাধে! তুমি তো সুখেই আছ! প্রেমের গোপন কথা কাউকে বল্‌তে নেই।

চণ্ডীদাস—আগে আলোচনা করা হয়েছে।

৪১

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু......

পদকর্তা জ্ঞানদাসের সর্বজনপরিচিত আক্ষেপানুরাগের একটি বিখ্যাত পদ। রাধার এই আক্ষেপ অনুরাগজনিত এবং অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। রাধা বলছেন, আমি সুখের জন্য এই ঘর বাঁধলাম, কিন্তু তা আগুনে পুড়ে গেল। প্রেমরূপ অমৃতসাগরে স্নান করতে গিয়ে তা বিরহ জ্বালারূপ বিষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সখি! এই কি লেখা আছে আমার কর্মফলে? আমি ভাবি এক, হয় অন্য। করতে যাই এক, ফল হয় অন্য। আমি শীতল মনে করে' প্রেমরূপ চন্দ্রের সেবা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে দেখি সূর্যের তীব্র দহনজ্বালা! উঁচু ভেবে পর্বতে চড়্‌তে গিয়ে আমি অগাধ জলে পড়ে গেলাম। চাইলাম আমি সম্পদ ও শ্রীকে, পেলাম দারিদ্র্য ও বঞ্চনা। আমি অবহেলায় মাণিককে হারালাম। আমি নগর স্থাপন করে', সাগরকে বেঁধে ভাবলাম মাণিক পাব অর্থাৎ নানা কষ্টসাধ্য কাজ করলাম,

প্রিয়তমকে পাব এই প্রত্যাশায়। কিন্তু আমার কর্মদোষে সমুদ্র পর্যন্ত শুকিয়ে গেল, তাই মাণিকও কোথায় আত্মগোপন করলো। আমার তৃষ্ণা মেটাবার জন্য মেঘের (বৃষ্টির) আরাধনা করলাম, কিন্তু তার বদলে বজ্রের আঘাত পেলাম। অর্থাৎ আমার প্রেমতৃষ্ণা মেটাবার জন্য প্রিয়তমের আরাধনা করতে গিয়ে তীব্র আঘাতই পেলাম। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলছেন, কৃষ্ণের প্রেম মরণের চেয়েও কঠোর আঘাত হানে।

জ্ঞানদাস—কারুর মতে পদটি চণ্ডীদাসের। সরলতা ও সহজ প্রকাশের জন্য এই সন্দেহ। কিন্তু জ্ঞানদাস তো চণ্ডীদাসেরই ভাবশিষ্য। গুরুর রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রবণতা তাঁর রচনায় থাকতেই পারে। জ্ঞানদাস সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি।

মান ও কলহান্তরিতা

আমরা বলেছি, নায়ক-নায়িকা যেখানে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, সেখানেও অকারণে কখনও বা সামান্য কারণে নায়িকার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। সেই ঈর্ষাহেতু নায়িকা নায়কের প্রতি বিরূপ আচরণ করলে তাকে মান বলে। প্রেমের পথ বড়ই অসরল।

প্রতি-নায়িকা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করে' সকালে নায়ক এসেছেন নায়িকা রাধার কুঞ্জে। দেহে তাঁর গত রাত্রির বিলাসচিহ্ন অঙ্কিত, চক্ষু রাত্রি-জাগরণে আরক্ত। অভিসারিকা রাধিকা নিত্যদিন কুঞ্জ সাজিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু সেদিন কৃষ্ণ আসেননি। পরের দিন সকালে এই বিলাসচিহ্ন নিয়ে উপস্থিত কৃষ্ণকে দেখে নায়িকার তো রাগ হবেই এবং কৃষ্ণের এই আচরণে চিত্তে নিদারুণ মান হয়েছে। তিনি মানের বশবর্তিনী হয়ে কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেও পরে তাঁর মনে অনুতাপ দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় অনুতপ্তা নায়িকাকে বলা হয় কলহান্তরিতা। শ্রীকৃষ্ণ গোড়ায় তাঁর মান ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন, তখন রাধা খণ্ডিতা নায়িকা। রাধার

মানভঞ্জনের অনেক উৎকৃষ্ট পদ আছে। যখন কৃষ্ণ চলে গেছেন, তখন নায়িকার অনুতাপ দেখা দেওয়াকে তাই বলে কলহান্তরিতা। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, নিশ্বাস প্রভৃতি এই অনুতাপের লক্ষণ।

ত্রিপুরাবাবু বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই বহুবল্লভ। তিনি একান্তভাবে কাহারও নন, তিনি বিশ্বজনের, তাঁহাকে যে যেভাবে ভজনা করে, সে সেইভাবে পায়। রাধা গোপী-শ্রেষ্ঠা, প্রেমের উৎকর্ষে তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন, তথাপি তিনি একান্তভাবে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলে বঞ্চিত হইবেন।" রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের পদের মধ্যে সাহিত্যবিচারে সৌন্দর্যহানির কথা বলেছেন। অন্যদিকে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, নিছক সাহিত্য হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলীর বিচার সঙ্গত নয়। শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই চন্দ্রাবলীর অবতারণা। তবে আনন্দের সংবাদ এই যে, শুধু শ্রীরাধা নন, শ্রীকৃষ্ণও রাধার বিরহে অনুতপ্ত। ফলে মান-পর্বের-শেষে দু'জনের মিলন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। রাধা ক্ষুব্ধা হয়ে থাকলে তো কৃষ্ণের লীলা অসম্পূর্ণ থাকে। তাই ঈশ্বর নিজের গরজে ভক্তের মান ভাঙান। ঈশ্বর যে সকলের—এই বোধ না থেকে যদি ভাবি ঈশ্বর শুধু আমারই। তখনই দেখা দেয় অভিমান। রাধার কাছে কৃষ্ণের মান ভাঙানো ও তাসত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান, রাধার অনুতাপ—সব ক'টি স্তরবিন্যাস খুবই মনস্তত্ত্বসম্মত।

৪২

আঙ্কল প্রেম পহিল নহি জানলু.......

রাধার মান ও হৃদয়ের বেদনার কথা সখীদের কাছে বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁর চিত্তের ভাবাকুলতার কথা পদকর্তা গোবিন্দদাস এখানে বর্ণনা করেছেন। রাধা বলছেন, কৃষ্ণের প্রেমে অন্ধ হ'য়ে কৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না। শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু আমার নন, তিনি যে সকলের হৃদয়বল্লভ, আগে সে কথা বোঝবার চেষ্টা না করে' ভেবেছিলাম একাই তাঁর আদর পাব। এখন তাঁর সঙ্গে বিবাদ করে' দিবারাত্র প্রাণের জ্বালায় জ্বলছি। সখি! তোমাকে মনের

জ্বালার কথা বললাম। কৃষ্ণের দোষ দেখে যে সুন্দরী কুপিতা হন, জগতের মধ্যে সে নিজেই তাপিত হয়। কৃষ্ণের মিনতি উপেক্ষা করে' আমি নিজের মানটাকেই গুরুত্ব দিয়ে বড় করে' দেখেছিলাম। মানভঙ্গের পর সেই আমার অবস্থা মদনদেবের কুসুমশরে বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এখন আর তাঁর দেখা পাই না। যতক্ষণ মান ছিল, কামদেবের শরে কাতর হয়েও মিলনের আকাঙ্ক্ষার বাঁধ বেঁধে রেখেছিলাম। কিন্তু মানভঙ্গের শেষে এখন ধৈর্য ও লজ্জা দুটোই চলে গেল। এই অবস্থায় কতদিন বেঁচে থাক্‌বো, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, হে সুন্দরী নারী! কানুর প্রেমের রীতিই এই রকম। অর্থাৎ তিনি সকল জীবেরই হৃদয়বল্লভ।

গোবিন্দদাস—আগে আলোচনা করেছি।

৪৩

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ……

পদকর্তা জ্ঞানদাসের এই পদে আমরা মানভঞ্জনের একটি চিত্র লক্ষ্য করি। রাধা মান করেছেন। তাই কৃষ্ণ মানভঞ্জনের জন্য অনুরোধ করছেন। কৃষ্ণ তাই রাধাকে অনুনয় করে' বলছেন, হে রাধা! তুমি মুখ তুলে চাও। তোমার চোখের নাচনে আমার হৃদয়ও নেচে উঠ্‌বে। তুমি গৌরবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিধান করলে কেবল তোমার কথাই মনে পড়বে। তাই তোমারই মনোরঞ্জনের জন্য আমি পীতবস্ত্র পরিধান করেছি। যদি তুমি একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলো আমার প্রাণ বেদনায় দীর্ণ হয়ে ওঠে। হে রাধে! আমাকে আর কত পরীক্ষা করবে? জগতের সকলেই জানে তোমার জন্য আমার আরাধনার কথা। তোমার সাধের বাঁশীটি তোমাকেই দিয়ে দিচ্ছি, তুমি এটা নাও। তোমার চরণ স্পর্শ করতে চাইছি। তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে চোখ আমার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। তোমার চোখের কাজল পরের চিত্ত চুরি করতে দক্ষ। তুমি রূপে-গুণে যৌবনশ্রীতে পৃথিবীতে সকলের অগ্রগণ্যা। ঈশ্বর তোমাকে নির্মাণ করেছেন প্রেমের আধার করে। রূপযৌবনের এতো সম্পদে যে ধনী, সে কেন

এত কৃপণ আমাকে প্রেম দিতে ? পদকর্তা জ্ঞানদাস বলছেন, এর মর্ম কে জান্‌বে, এর তাৎপর্য কে-ই বা বুঝবে!

জ্ঞানদাস—আগেই আলোচনা করেছি।

নিবেদন

আমরা ভূমিকায় বলেছি, প্রার্থনার মধ্যে আমরা যেমন উপাস্য ও উপাসককে পাই, নিবেদনের পদে পরস্পর আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়। এই নিবেদনেই প্রেমের চরম সার্থকতা। নিবেদনের পদে রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পর সখ্য ও আত্মনিবেদনের ভাবটাই পরিস্ফুট। এই নিবেদনের মধ্যে দিয়েই সমস্ত দ্বৈতভাবের বিলুপ্তি ঘটে। এখানেই প্রেমের চরম সার্থকতা। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই শ্রেণীর পদরচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী। প্রার্থনার পদগুলিতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নিবেদনের পদগুলিতে আত্মনিবেদনের ভাব থাকলেও কৃষ্ণ এখানে সখা। যথার্থ প্রেমে কেউ যেন কারুর অন্ত খুঁজে পায় না। সেখানে মিলনের মধ্যেও বিরহের সুর, মিলনেও অতৃপ্তি। এইভাবেই ঈশ্বরকে ভালবেসে নিজেকে নিবেদন করলে, ঈশ্বরও সেই প্রেমের প্রতিদান দেন।

৪৪

বঁধু কি আর বলিব আমি……

পদকর্তা চণ্ডীদাসের একটি সার্থক পদ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, হে বন্ধু! তোমাকে আমি নতুন করে' আর কি বলবো? শুধু কামনা করি, মৃত্যুকালে নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে যেন তোমাকেই আমি প্রাণনাথ রূপে পাই। শুধু এক জন্মে নয়, যতবার জন্মাব, ততবার তুমিই আমার একমাত্র প্রিয়তম থেকো। তোমার চরণযুগলের সঙ্গে আমার প্রাণের যেন প্রেমের বন্ধন লেগেছে। সব কিছু তোমাকেই সমর্পণ করে' একাগ্রচিত্তে নিশ্চিতরূপে তোমারই দাসী হলাম। তোমার চরণের আশ্রয় মুহূর্তমাত্র সরিয়ে নিলে আমার প্রাণ চলে যাবে। আমি

ভেবেছিলাম, এই তিন ভুবনে আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই। 'রাধা' নামে কেউ আমাকে ডাকৃতে নেই, আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? পিতৃকুল ও স্বামীকুল—এই দু'কুলেই এবং গোকুলেও আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই। পরম নিশ্চিন্ত ভেবে তোমার চরণকমলে আশ্রয় নিলাম। ছল করে যেন আমাকে দূরে ঠেলে দিও না—সরলা অবলা হিসেবে আমার প্রতি যে ব্যবহার সঙ্গত, তাই যেন তোমার কাছে পাই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, প্রাণনাথ ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নেই। পলকমাত্র কৃষ্ণকে দেখ্‌তে না পেলে মনে হয় যেন প্রাণে আর বাঁচবো না। তাই পদকর্তা চণ্ডীদাস বল্‌ছেন, শ্রীরাধার মনে হয় কৃষ্ণ যেন তাঁর স্পর্শমণি। তাঁকে গলায় হার করে' পরলে মুহূর্তের জন্য তাঁকে হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

চণ্ডীদাস—আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

৪৫

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ……

পদকর্তা চণ্ডীদাস এই পদেও রাধার আত্মনিবেদনের আকুলতা প্রকাশ করেছেন। শ্রীরাধা বল্‌ছেন, হে প্রিয়তম! তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ। আমার দেহ-মন, আমার কুল, শীল, জাতি, মান সবই তোমাকে সমর্পণ করেছি। আমি জানি, তুমি কৃষ্ণ, বিশ্বেরই নাথ—যোগীর আরাধনার ধন। কিন্তু আমি সামান্যা গোপবধূ, আমি তো তেমনভাবে তোমার ভজনপূজন করতে পারবো না। আমি কেবল আমার দেহমনকে প্রেমরসে ডুবিয়ে তোমার পায়ে সমর্পণ করেছি। আমি জানি, তুমি-ই আমার স্বামী—তুমিই আমার গতি। তাই আমার মনে অন্য কোনও আশঙ্কা বা ভয় নেই। যখন সকলে আমাকে কলঙ্কী বলে, তাতেও আমার কোনও দুঃখ নেই। তোমার জন্য গলায় কলঙ্কের হার পরাতেও পরম সুখ আছে। তুমি-ই জানো আমি সতী কি অসতী! আমি জানি না ভাল কি, মন্দ-ই বা কি! পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, পাপই হোক, পুণ্যই হোক শ্রীরাধার কাছে দু-ই সমান, কেননা, শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলই তাঁর কাছে সর্বস্ব। এই আত্ম-

নিবেদনের মধ্যে দিয়েই সকল দ্বৈতভাবের অবসান ঘটে। এই আত্মবিলুপ্তির মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা।

চণ্ডীদাস—আগে আলোচনা করেছি।

৪৬

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী……

পদকর্তা জ্ঞানদাসের একটি সার্থক নিবেদনের পদ। এখানেও রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। শ্রীরাধা বলছেন, হে বন্ধু! আমি তোমার গর্বেই গর্বিতা—তোমার রূপালোকেই আমি রূপান্বিত। আমার সব সময়ে মনে হয়, যে এই চরণ দুটি যেন সর্বদাই নিজের বুকে ধরে রাখি। তোমাকে ভালবেসে আমি মহিমান্বিতা। অন্য নারীর আপনজন অনেক আছে; কিন্তু আমার আছ একমাত্র তুমি ই। আমি তোমাকে আমার প্রাণের চেয়েও শত শতগুণ প্রিয়তম বলে মনে করি। হে কালাচাঁদ। তুমি আমার চোখের কাজল, তুমি আমার অঙ্গের অলংকারস্বরূপ। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলছেন, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যে প্রেমের বন্ধন, তার মনের সঙ্গে মনের বন্ধন!

জ্ঞানদাস—আগেই আলোচনা করেছি।

মাথুর

আমরা আগেই বলেছি, মথুরায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে সংহার করেছিলেন। কিন্তু তিনি আর বৃন্দাবনে ফিরে এলেন না। সকলকে বিদায় দিয়ে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা শুরু হল। বৃন্দাবনে ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা। তাই কৃষ্ণ বিরহে সমগ্র বৃন্দাবন অন্ধকার, বিরহের বেদনায় হাহাকার করে উঠ্‌লো।

প্রেমতত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, বিরহ প্রেমেরই অঙ্গ। মিলনের আনন্দকে পরিপূর্ণ করে' তোলে বিরহ। মধুর রসের মধ্যে আমরা পাই, মিলনের পূর্বাবস্থা বা পূর্বরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ইত্যাদি। বিরহ এই

মিলনের পূর্বাবস্থা বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত। বিরহের পদ-ই মাথুর-বিষয়ক পদ।

কৃষ্ণের প্রেমে যে রাধার আকুলতা, সেই প্রেমের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে জীবন হয়ে উঠেছে বেদনাময়। এই দুঃখে কে দেবে সান্ত্বনা? কৃষ্ণপ্রেমে রাধা ভেবেছিলেন সুখ পাবেন, কিন্তু এ প্রেমের জ্বালা যে দুর্বিষহ। বিরহ-ই তো প্রেমের চরম পরীক্ষা ও সার্থকতা। কৃষ্ণের মথুরায় চলে যাওয়া নিয়ে রাধার যে দুঃখ, যে বিরহ, তাই মাথুর। সুতরাং কলহান্তরিতা রাধার যে দুঃখ বা ব্যাকুলতা, তা বিরহ বটে, কিন্তু মাথুর নয়। মানবাত্মার এক তীব্র আর্তি মাথুরের পদগুলিকে পদাবলী সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

আমরা জেনেছি, "মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহ-ই অধিকতর সহনীয়, কারণ মিলনে যাকে কাছে পাই, বিরহে তাঁকে নিখিলের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিই।" বিরহ-শূন্য প্রেম অগভীর। চণ্ডীদাস বলেছেন, "সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তার ঠাঁই।" এই দুঃখটুকু না থাক্‌লে প্রেমের সুখের তীব্রতা আস্বাদ্য হ'য়ে ওঠে না।

৪৭

অব মথুরাপুর মাধব গেল......

মাথুর-শ্রেণীর পদরচনায় শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বিদ্যাপতি আলোচ্য পদটির রচয়িতা। বৃন্দাবনের লীলা শেষ করে' সকলের চিত্তে হাহাকার তুলে শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায় কংসনিধন উপলক্ষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলেন মথুরায়। এদিকে কৃষ্ণবিহনে শ্রীরাধার চিত্তদীর্ণ হাহাকার শোনা গেল। শ্রীরাধা বল্‌ছেন, এখন মাধব মথুরাপুরে চলে যাওয়ায় মনে হচ্ছে যেন গোকুলের মণিকে কে চুরি করে' নিয়েছে। সারা গোকুলে চোখের জলের ঢেউ বয়ে চলেছে। শোকের হাহাকারে যেন সমস্ত গোকুল উচ্ছলিত। এখন চারদিকে শুধুই শূন্যতা—গৃহ, দেশ, চারিদিক সবই আজ শূন্য। ভেবে পাই না, যমুনার তীরে আর কি করে যাব, কি করেই বা কুঞ্জ কুটিরের দিকে তাকাব। যেখানে সখীদের নিয়ে কৃষ্ণের

সঙ্গে ফুল-খেলা করতাম, সেদিকে তাকিয়ে কি করেই বা বেঁচে থাকবো? বিদ্যাপতি বলছেন, কানু তো চিরকালের জন্য চলে যাননি। হে রাধে! শোনো! তিনি নিতান্ত কৌতুক করবার জন্যই সেখানে গিয়ে লুকিয়ে আছেন।

বিদ্যাপতি—আগেই আলোচনা করেছি।

৪৮

অঙ্কুর তপনতাপে যদি জারব……

আলোচ্য পদটিও বিদ্যাপতির একটি উল্লেখযোগ্য মাথুরের পদ। রাধার বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ চলে গেছেন মথুরায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করে' করে' দীর্ঘকাল কেটে গেছে। তিনি আর কবেই বা ফিরবেন? এলেও কি লাভ হবে কিছু? অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি সূর্যের উত্তাপ লেগে কোন কিছু পুড়ে যায়, তখন জলবাহী মেঘ কি-বা করতে পারে? এই নবযৌবন-ই যদি বিরহের আগুনে পুড়ে কাটাতে হয়, পরে সেই প্রিয়তমের ভালবাসা পেয়ে কি লাভ? হে হরি! কোন্ দুর্দৈব এমন দুর্দশা ঘটালো? সমুদ্রের কাছে থেকেও যদি পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে যায়, কে আর এই তৃষ্ণা দূর করতে পারে? চন্দন গাছ যদি গন্ধ বিতরণ করা ছেড়ে দেয়, চন্দ্র যদি আগুন বর্ষণ করে, সে তো পরম দুর্ভাগ্য। চিন্তামণি রত্নের মতো মূল্যবান রত্ন যদি নিজের গুণ ত্যাগ করে, তা হ'লে আমার মত দুর্ভাগা আর কে আছে? মেঘ যদি শ্রাবণ মাসেও একবিন্দু বৃষ্টি বর্ষণ না করে, কল্পতরু যদি বন্ধ্যা হ'য়ে যায়, তা হ'লে গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেও তাঁর কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে না। পদকর্তা বিদ্যাপতির কাছে এই ব্যাপার খুবই রহস্যপূর্ণ, তিনি যেন ধাঁধায় পড়ে গেলেন। কারণ সমুদ্রের কাছে গিয়েও তৃষ্ণার্থ হয়ে ফিরে আসা, চন্দন বৃক্ষের কাছে গন্ধ না পাওয়া, চন্দ্রের কিরণে অগ্নিতাপ, শ্রাবণের মেঘে একবিন্দু জল না পাওয়া, চিন্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি কৃষ্ণের সেবা করেও ফল না পাওয়ার মতোই বিদ্যাপতির কাছে রহস্যজনক।

বিদ্যাপতি—আগে আলোচনা করেছি।

৪৯

এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর……

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে' কংসনিধনের জন্য মথুরায় গিয়ে আর ফিরে এলেন না। তাই রাধা বিরহমগ্না। এমন সময় দেখা দিল বর্ষা। বাদলমুখর দিনরাতে রাধার বিরহ তীব্রতা পেল। তাই রাধা সখিকে বলছেন, সখি গো! আমার যে দুঃখের সীমা নেই। এই ভাদ্রমাসের ঘোর বর্ষায় আমার গৃহ শূন্য। একা আমি। ওদিকে মেঘ গর্জন করছে, সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে' পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে' বর্ষার অবিরল ধারা বর্ষিত হচ্ছে। এই সময়ে আমার প্রিয়তম প্রবাসে। নিষ্ঠুর কামদেব তার তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করছে। শত শত বজ্রপাত হচ্ছে, তা দেখে ময়ুর আনন্দে নৃত্য করছে। ব্যাঙ মত্ত হয়ে ডাকছে, ডাকপাখী ডেকে চলেছে। এই পরিবেশে আমার হৃদয় কামের আঘাতে বিরহ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে। দশদিক্ ব্যাপ্ত করে' অন্ধকার নেমে এসেছে। রাত্রি অতি ভয়ানক, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পদকর্তা বিদ্যাপতি সমবেদনা জানিয়ে বলছেন, হরিকে ছেড়ে একাকী রাধা কি করে' এই রাত্রি যাপন করবে?

বিদ্যাপতি—কোনও কোনও প্রাচীন সঙ্কলক এই পদটিকে রায়শেখরের পদ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মত, এই পদটি বিদ্যাপতির। তাঁর সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি।

৫০

চির চন্দন উরে হার না দেলা……

আলোচ্য পদটিও মাথুর-বিষয়ক পদরচনায় শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বিদ্যাপতির একটি সর্বজনপরিচিত ও রসোত্তীর্ণ পদ। কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে গেছেন রাধাকে বৃন্দাবনে রেখে, রাধা একাকী বিরহে দগ্ধ হ'য়ে সখীদের বলছেন, যাঁর সঙ্গে মিলনে এতটুকু বাধা হবার আশঙ্কায় আমি আমার বক্ষদেশে বস্ত্র দিতাম না, চন্দন ও হার-ও পরিনি, সেই প্রিয়তম আজ আমার সঙ্গে নদী-পর্বতের দূরত্ব ও

ব্যবধান রচনা করেছেন। যে প্রিয়তমের গর্বে আমি কাউকেও গ্রাহ্য করতাম না, সেই প্রিয়তম চলে গেছেন বলে' কে আমাকে কী-না বলছে, অনেক কটু কথা সহ্য করতে হচ্ছে আমাকে। মনের মধ্যে বড় বেদনা রয়ে গেল যে প্রিয়তম আমাকে যদি ভুলেই গেলো, তা হ'লে আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ? কিন্তু এর জন্য প্রিয়তমের কোনও দোষ নেই। আমার কর্মফলের জন্য এই অবস্থা হয়েছে আমার। পূর্বজন্মে বিধাতা আমার ভাগ্যে যা লিখেছিলেন, তা-ই হলো। অন্যের প্রতি অনুরক্ত হয়েই প্রিয়তম আজ অন্য দেশে গেল। এদিকে প্রিয়তমকে না পেয়ে আমার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন, হে সুন্দরী নারী! ধৈর্য ধরে' অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটবেই।

বিদ্যাপতি—আগেই আলোচনা হয়েছে।

৫১

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি……

আলোচ্য পদটি গোবিন্দদাসের একটি উল্লেখযোগ্য পদ। এখানে রাধা সখীকে বলছেন, নামেই অক্রুর (সরল), কিন্তু আসলে তার মতো ক্রুর (নিষ্ঠুর) আর দুটি নেই। সেই ব্যক্তি আজ এসেছে বৃন্দাবনে। সে ঘরে ঘরে শ্রুতিকটু ঘোষণা করে দিয়েছে যে কালকে, ঠিক কালকেই মথুরায় যাবার জন্য সাজগোজ করে' তৈরি হও। হে সখি! এই রাত পোহালেই তো সেই 'কাল' দেখা দেবে। এখন এমন একটা উপায় বের কর, যাতে প্রভাত না হ'তে পারে। তা হ'লেই শ্রীকৃষ্ণ গৃহে থেকে যাবেন। যোগিনীর চরণ ধরে' সাধ্য সাধনা কর, যাতে তিনি চাঁদকে বেঁধে রেখে দেন—তা' হ'লেই তো প্রভাত হবে না। নক্ষত্র ও চাঁদ আকাশে ব্যক্ত হ'য়ে থাক্, যাতে প্রভাত না হয়! যোগিনী দেবী যদি বেঁধে রাখতে না পারেন, তা হ'লে যমুনা দেবীকে তুষ্ট কর, তাঁকেই বলো! তিনি যেন তাঁর পিতা সূর্যকে আটকে রেখে আকাশে প্রকাশ হ'তে না দেন। তা হ'লেই

তো সকাল হবে না। যমুনা দেবী রাজি না হ'লে তাঁর ভ্রাতা যমরাজকে ডেকে আনো। তাঁর সঙ্গে তা' হলে এক্ষুণি মিলিত হবো অর্থাৎ তবে মৃত্যুবরণ করবো। পদকর্তা গোবিন্দদাস অনুমান করেন, শ্রীরাধার মনোভাব এরকমই হয়েছে।

গোবিন্দদাস—আগে আলোচনা করা হয়েছে।

৫২

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল········

পদকর্তা গোবিন্দদাসের একটি উল্লেখযোগ্য পদ। শ্রীরাধা বলছেন, প্রেমের অঙ্কুর জন্মলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই রৌদ্র দেখা দিলে দুটি কচি পল্লবও মেল্‌বার সুযোগ পায় না। অর্থাৎ মনে প্রেমের জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে নানা বাধারূপ তাপ নবপ্রেমের কচি পাতা দুটিকে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ দিল না। প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদ রাত্রিতে উদিত হ'লে যেমন অন্ধকার কাটে না, তা যেমন অন্ধকারে হারিয়ে যায়, সেরকমই কণামাত্র সুখ পেয়েই তা হতাশায় পূর্ণ হয়ে গেল। হে সখি! মাধব আমার প্রতি বড় নিষ্ঠুরভাবাপন্ন, তা না হ'লে মিলনের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত তিনি ভুলে যান। কেউ কি ভাব্‌তে পেরেছে চাঁদ চকোরকে বঞ্চিত করবে? মাধবী মৌমাছিকে করবে বিরূপ? শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের এই রীতি দেখে অনুভব করছি এবং অনুমান করছি, বিধির বিধানে কোন অঘটন ঘটবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের অস্বাভাবিক প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে বিধাতার বিধানে বুঝি সব ওলটপালট হ'য়ে গেল। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেম জানাবে না—এতো সৃষ্টিছাড়া নিয়ম। আমার পাপ প্রাণ আর কিছুই জানে না, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে' কাঁদে। এরজন্য বিদ্যাপতি মাধবকে করুণাহীন বল্‌তে পারেন, কিন্তু পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, মাধব রসিক। তাই কৃষ্ণ এই রকম আচরণ করছেন রাধার সঙ্গে।

গোবিন্দদাস—আগেই আলোচনা আছে।

৫৩

যাঁহা পঁহু অরুণ-চরণে চলি যাত……

পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীরাধার মনের যে দ্বন্দ্ব তা অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। শ্রীরাধার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।—বিরহ ও মৃত্যু কোন্‌টি অধিক কাম্য? অবশেষে শ্রীরাধা মৃত্যুকেই অধিক বরণীয় মনে করলেন। কিন্তু মৃত্যু হ'লে দেহ তো পঞ্চভূতে বিলীন হ'য়ে যাবে, তখন তো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ ভোগ করা হবে না। এই দ্বন্দ্বে রাধার চিত্ত যখন আকুল, তখন তিনি নিজেই তার সমাধান করলেন—মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করলেন। তাই তিনি কামনা করে যা বলেছেন, গোবিন্দদাস সেই কামনার কথাই এই পদে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীরাধা বলছেন, আমার প্রিয়তম তাঁর গোলাপী আভাযুক্ত চরণে যেখান দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করবেন, সেই সেই জায়গার মাটিতে রাধার দেহ মিশে থাকবে। মৃত্যুর পর তো দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের মধ্যে মিশে থাকে। যে আয়নায় প্রভু নিজের মুখ দেখেন, আমার দেহ যেন আলো হ'য়ে (তেজ) সেখানে বিরাজ করে। হে সখি! বিরহ ও মৃত্যুর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আজ তার অবসান ঘটলো। আমি এইভাবেই বিরহের অবসান ঘটিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবো। যে সরোবরে প্রিয়তম নিত্য স্নান করেন, আমার দেহাংশ জল (অপ্) হ'য়ে সেই সরোবরে বিরাজ করবে। যে বাতাসে (মরুৎ) শ্রীকৃষ্ণ দেহে বাতাস লাগান, আমার দেহ যেন সেখানে মৃদু পবন হ'য়ে বয়ে চলে। আমার প্রভুর বিচরণক্ষেত্র যে নীল আকাশ (ব্যোম), আমার দেহ যেন আকাশ হ'য়ে তাঁর কাছে থাকে। গোবিন্দদাস বলছেন, হে গৌরতনুবতি! সেই পান্নাতুল্য দেহধারী তোমাকে শ্যাম ছেড়ে দেবেন কেন? বিরহ ও মৃত্যুর যে দ্বন্দ্বে রাধা এতোক্ষণ দোলাচল চিত্তে ছিলেন, এখন তার অবসান ঘটলো, কারণ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এতভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব।

গোবিন্দদাস—আগে আলোচিত হয়েছে।

ভাবোল্লাস ও মিলন

ভূমিকায় বলেছি, ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলন বল্‌তে আমরা বুঝি, শ্রীকৃষ্ণ কংসনিধনের জন্য মথুরায় গমন করলে সমগ্র বৃন্দাবন শোকে আচ্ছন্ন। শূন্য বৃন্দাবনে রাধার বিরহের আর্তি শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফেরেননি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে রাধা তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই এই ভাবরাজ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই মিলনের নামই ভাবসম্মেলন বা ভাবোল্লাস। এই মিলন চিরমিলন, এখানে বিরহ বা বিচ্ছেদের কোনও অবকাশ নেই। বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা একটি জরুরী কথা এ প্রসঙ্গে বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো বলেছিলেন, বৃন্দাবন ত্যাগ করে' আমি এক পা-ও নড়বো না। তা হ'লে তিনি মথুরায় গেলেন কি করে, রাজত্বই বা করলেন কেমন করে? এর উত্তরে তত্ত্ববিদ্‌রা বলছেন, কৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় তিনি নিত্য বৃন্দাবনে বিরাজিত, অন্যদিকে প্রকট লীলায় তিনি কংসবধের জন্য ও রাজত্ব করবার জন্য মথুরায় গমন করেছিলেন। ফলে রাধার সঙ্গে ভাবসম্মেলনে যে মিলন, তা অপ্রকট লীলায় মিলন নিত্য বৃন্দাবনে।

তাই রাধা-কৃষ্ণের যে লৌকিক মিলন, সেখানে বিরহ আসতেই পারে। কিন্তু ভাবজগতের মিলনে বিরহের স্থান নেই, সে মিলন ভাবলোকে, বস্তুলোকে নয়। রাধা তখন বলেন, "এ হিয়া হৈতে বাহির হইয়া কেমনে আছিলে তুমি।" একদিকে কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি-রক্ষা যে রাধার কাছে তিনি ফিরে আসবেন-ই, অন্যদিকে কর্তব্যের আহ্বানে মথুরায় বাস করা দু'দিক-ই বজায় রেখেছিলেন কৃষ্ণ তাঁর লীলায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাবসম্মেলন রাধাকৃষ্ণ মিলনের শেষ কথা বলেছে—যে মিলন বিরহশূন্য, বিচ্ছেদহীন—চিরমিলনের বাণী বহন করে চলেছে। এই শ্রেণীর পদরচনায় বিদ্যাপতি-র সার্থকতা ও কবিত্ব অতুলনীয়।

৫৪

আজু রজনী হাম……

বিদ্যাপতি কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার চিরমিলনের উল্লাস রাধার চিত্তে কিভাবে

প্রকাশ পেয়েছে, তা বর্ণনা করেছেন। রাধা বলছেন, আমার বহু ভাগ্য যে রাত্রি আজ প্রভাত হলো এবং আমি প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন করলাম। এতদিনে মনে হচ্ছে আমার জীবনযৌবন সার্থক হলো, সর্বদিক যেন প্রসন্নতার আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। আজ আমার গৃহকে গৃহ বলে মেনে নিলাম। আজ আমার দেহকে দেহ বলে মনে হচ্ছে অর্থাৎ আজ এই মিলন প্রভাতে আমার গৃহ এবং আমার দেহ সত্যরূপে প্রকাশ পেলো। বিধাতা এতদিন পরে আজ আমার প্রতি অনুকূল হলেন। আজ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব পেরিয়ে সব সন্দেহ দূরীভূত হলো। সেই সব কোকিল—যারা আমাকে এতোদিন পীড়িত করেছে—এখন লক্ষ বার ডাকুক, এখন লক্ষ চন্দ্র হোক্ না কেন উদিত, কামদেবের পঞ্চশর এখন লক্ষশর হোক্ আর মলয় পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হোক্! এতদিন পর্যন্ত প্রিয়তম কৃষ্ণকে না দেখে এইসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনন্দ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ প্রিয়তমকে কাছে পেয়েছি, তাই আজ এইসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আহ্বান করছি। আজ যখন প্রিয়তমের সঙ্গসুখ পেলাম, তখন নিজ দেহকে সার্থক বলে মেনে নিলাম। পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন, হে রাধে! তোমার ভাগ্য সামান্য নয়, ধন্য মানি তোমার নিত্যনবায়মান প্রেম।

বিদ্যাপতি—আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

৫৫

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর ......

ভাবলোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন ঘটেছে। পদকর্তা বিদ্যাপতি সেই চিরমিলনের আবেগ-উচ্ছ্বাস অপরূপ ভাষায় এখানে প্রকাশ করেছেন। পদটি সর্বজনপরিচিত। প্রিয়মিলনের আবেগে উল্লসিত শ্রীমতী বলছেন, হে সখি! কি করে' বর্ণনা করবো আমার এই মিলনের সীমাহীন আনন্দের কথা? মাধব শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনের জন্য আমার গৃহে ধরা দিলেন। নিঠুর চন্দ্রকিরণে যত দুঃখ পেয়েছি, আজ প্রিয়তমের মুখ-দর্শনে ততখানি সুখ পেলাম। শ্রী

প্রিয়তমকে অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে পাঠায়। কিন্তু যদি আঁচল ভরেও আমাকে কেউ মূল্যবান রত্নরাজি দেয়, তবুও আমি প্রিয়তমকে দূরদেশে পাঠাতে রাজী নই। প্রিয়তম আমার কাছে শীতকালীন গাত্রাবরণ, গ্রীষ্মকালীন বাতাস, বর্ষাকালীন ছত্র, নদীতে পারাপারের জন্য নৌকার মতোই অপরিহার্য এবং প্রিয়। পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন, হে সুন্দরী নারী! সুজন যে হয়, তার দুঃখ স্থায়ী হয় না বলেই অল্পসময়ের মধ্যে তোমার দুঃখের অবসান ঘটে, মিলনের প্রসন্নালোকে সুখাস্বাদ পেলে।

বিদ্যাপতি—আলোচ্য পদটি সম্পর্কে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, "পদটি শান্তিপুরে সমাগত সদ্য সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে লক্ষ্য করে' অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক গীত।" পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

৫৬

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে

আলোচ্য পদটি বিদ্যাপতির সমগ্র পদরচনার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ পদগুলির অন্যতম। ভাবসম্মেলনের পদ হিসেবেও সার্থকও উচ্চাঙ্গের।

আলোচ্য পদে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার তীব্র আনন্দে এই আবেগ প্রকাশ করেছেন। অনেক দিন পরে প্রিয়তম যখন আমার এই বাড়ীতে আসবেন, তখন আমি কি করবো, কিভাবে তাঁকে আপ্যায়ন করবো রাধা তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন, নিজের দেহকেই আমি যত রকমের মঙ্গলানুষ্ঠান প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নেবো। আমার এই দেহটিকেই আমি প্রিয়তমের জন্য বেদি করবো। নিজের চুল বিছিয়ে দিয়ে আমি সেই অঙ্গকে ঝাঁট দেবো। সেখানেই তো প্রিয়তম বসবেন। নিজের পরিহিত মুক্তোর মালাই হবে আলপনা। উৎসব-গৃহের দ্বারে যে দু'টি মঙ্গল কলস থাকে, আমার স্তনদ্বয় সেই মঙ্গল কলসরূপে ব্যবহার করবো। নিজের ভারী নিতম্বদেশ হবে

কদলীবৃক্ষসদৃশ—যা উৎসবগৃহে অপরিহার্য। আমার কিঙ্কিণী আন্দোলিত হবে আম্রপল্লব সদৃশ। উৎসব-গৃহে বহু নারীর সমাবেশ হয়। আমি এমনভাবে আমার ছলাকলা বিস্তার করবো যে মনে হবে যেন বহু রমণী চারপাশে সমবেত হয়েছে। কারণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বহু রমণী সমবেত হন। চারদিকে এমন রূপের মোহ প্রসারিত করবো যে মনে হবে যেন বহু সুন্দরী নারীর একত্র সমাবেশে চাঁদের হাট বসেছে। পদকর্তা বিদ্যাপতি তাই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, তোমার আশা পূর্ণ হবে। খুব শীঘ্রই প্রিয়তম তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন।

এতো গেলো ভাবের দিক্। তত্ত্বের বিচারে, এ যেন জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার প্রত্যাশায় অধীর হ'য়ে উঠেছে। সাধকের দেহই সমস্ত মঙ্গলানুষ্ঠানের ক্ষেত্র অর্থাৎ তাঁর দেহ-ই বেদী, নিজের কেশরাশি ঝাঁটা ইত্যাদি। The human body is the highest temple of God—এই সত্যই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। বহু দিন যাঁকে প্রত্যাশা করেছি, সেই প্রিয়তম কৃষ্ণকে পাবার অধীর আনন্দে বা ভাবোল্লাসে রাধার আবেগ এইভাবেই অধীরতা প্রকাশ করেছে।

বিদ্যাপতি—আগেই আলোচনা করেছি।

৫৭

সই জানি কুদিন সুদিন ভেল... ...

পদকর্তা চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত ভাবোল্লাস-বিষয়ক পদ। রাধা মিলনের আনন্দে সখিকে বলছেন, হে সখি! আজ আমার কুদিন সুদিনে পরিণত হয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই আমার গৃহে পদার্পণ করবেন, ভাগ্যগণনাকারী আমার অদৃষ্ট বিচার করে' জানিয়ে গেল। আনন্দে আমার চুলগুলি স্ফুরিত হচ্ছে, আমার বসন যেন অঙ্গে থাকতে চাইছে না। যে যৌবনকে এতোদিন ভার

বলে মনে করতাম, আজ তাতে পুলকের সঞ্চার হয়েছে। আমার বাঁ চোখ নাচ্ছে—এটা তো মেয়েদের পক্ষে শুভলক্ষণ ; আমার হার যেন আনন্দে দুলছে। সকালবেলা কাকেরা কোলাহল করে খাদ্য ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। কাক তো ভবিষ্যদ্বক্তা। কাকের বিভিন্ন ডাক শুনে শুভ-অশুভ বোঝা যায়। এই কাকের কাছে প্রিয়তমের আগমনবার্তা শোন্‌বার জন্য কত প্রশ্ন করেছি, খাদ্য দিয়েছি। কিন্তু কাকেরা খাবার খেয়ে চলে গেছে, জিজ্ঞাসার উত্তরে কোনও শুভ ইঙ্গিত করেনি। কিন্তু আজ তাদের যখন প্রিয়তমের আসবার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কাকেরা কাছে এসে উড়ে বসলো। আজ আনন্দের আতিশয্যে আমার মুখের পান মুখ থেকে খসে পড়ছে। দেবতার মাথার ফুলগুলিও খসে খসে পডছে। পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, সব-ই তো শুভ হলো, কেননা, বিধাতা তোমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন।

চণ্ডীদাস—আগেই আলোচনা করেছি।

পরিশিষ্ট—১

ভাবোল্লাস ও মিলন—৫৮

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
[১]এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
[২]এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
[৩](এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে॥

১. এতেক······হ'লে—আমি অবলা বলেই এই কষ্ট সহ্য করেছি। কিন্তু পাষাণ হলেও এত দুঃখে ফেটে যেত।

২. এ সব দুখ······কুশল মানি—আমার নিজের দুঃখকে দুঃখ বলে গণনা করি না, যদি তুমি কুশলে থেকে থাক।

৩. (এখন) কোকিল আসিয়া……হউক চন্দ—

দীর্ঘকাল বিরহের পর হৃদয়ের গভীরে ভাবের জগতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন হল। তাই শ্রীমতী ভাবোল্লাসে উল্লাসিনী হয়ে এই পদটিতে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বঁধু, বহুদিন পরে তুমি এলে। প্রাণবিয়োগ ঘটলে দেখাই হত না। পাষাণ হলে ফেটে যেত, আমি অবলা বলেই এত সহ্য করেছি। আমি দুঃখিনী, আমার দিন দুঃখেই কেটেছে। কিন্তু তুমি মথুরা নগরে অবশ্যই ভাল ছিলে। তুমি যদি কুশলে থাক, তবে আমি নিজের দুঃখকে দুঃখ বলে মনে করি না। হারানো রত্ন কোলে ফিরে পেয়ে আজ আমার আর কোনো দুঃখই নেই। এখন কোকিল এসে গান করুক, ভ্রমর গুঞ্জন করুক, মন্দ মন্দ মলয় পবন প্রবাহিত হোক —আকাশে চন্দ্রের উদয় হোক। (আমার বিরহ অবস্থায় এরা পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। এখন তোমাকে ফিরে পেয়ে আর আমি এদের ভয় পাই না।)